মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

(Reports on the Liberation War of Bangladesh in the Newspapers published by the Bangladesh Government in Exile and in the Liberated Territories)

এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

এমফিল গবেষণার শিরোনাম : মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

গবেষণার সারসংক্ষেপ (ABSTRACT)

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রায় শতাধিক পত্রপত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এসবের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা এবং ওইসব পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্যগুলো ইতিহাসে উপস্থাপন করাই এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। কেননা এসব পত্রপত্রিকা একদিকে রণাঙ্গনের খবর পরিবেশন করেছে, হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার চিত্র তুলে ধরেছে, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন ও তাদের মনোবল বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যুদ্ধ প্রচারণা ও জনমত গঠনেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব পত্রপত্রিকার সে সময়কার প্রতিটি সংবাদ ও প্রতিবেদন মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, গণহত্যা, পাকিস্তান সরকার এবং তাদের এদেশীয় দোসর তথা আলবদর, আলশামস ও রাজাকারদের তৎপরতা, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মরক্ষার তৎপরতা, মুক্তিযুদ্ধে ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি, যুদ্ধকালীন গুজব, মুক্তিযুদ্ধের সময় বহির্বিশ্বের সাহায্য ও সমর্থন, মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় সংক্রান্ত সংবাদ, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, সংবাদ বিশ্লেষণ ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া পত্রিকাগুলোর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং তাদের আদর্শগত অবস্থানসহ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন ও সমর্থনে এই পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলা একাডেমি পাঠাগার, জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সংরক্ষিত মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো সংগ্রহ করে তা এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু পত্রপত্রিকার সংকলন প্রকাশ হয়েছে। সেগুলো থেকেও তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত এসব পত্রপত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে এখনও যারা জীবিত আছেন তাদের নিবিড় সাক্ষাৎকার (In-depth Interview) গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাদের দেয়া তথ্য ও মতামত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই গবেষণায় মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের এসব পত্রপত্রিকার ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র হিসেবে এই গবেষণা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আহসান মাহমুদ

ইতিহাস বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

(Reports on the Liberation War of Bangladesh in the Newspapers published by the Bangladesh Government in Exile and in the Liberated Territories)

(এই গবেষণাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষের এম.ফিল. গবেষণার শর্তপূরণ হিসেবে সম্পন্ন হয়েছে)

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক : **ড. আশফাক হোসেন**
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক : **আহসান মাহমুদ**
রেজিস্ট্রেশন নং : ১৭০
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

১	ভূমিকা	১
২	প্রকাশনা পর্যালোচনা	৩
৩	তাত্ত্বিক কাঠামো	৬
৪	গবেষণা পদ্ধতি	৯
৫	অধ্যায় বিভাজন	১১
৬	মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার পরিচিতি ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা	১৩
৭	মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় রণাঙ্গনের খবর	৩৯
৮	মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, নির্যাতন ও গণহত্যার বিবরণ	৪৯
৯	মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের দিনলিপি	৬২
১০	আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং মুক্তাঞ্চলের পত্রপত্রিকা	৭৪
১১	মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার পাঠক মতামত	৮৬
১২	উপসংহার	৯৩
১৩	তথ্যপঞ্জি	৯৭
১৪	পরিশিষ্ট	
	১৪.১ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের মানচিত্র	১০১
	১৪.২ মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সম্পাদক ও সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকারের প্রশ্নপত্র	১০২
	১৪.৩ সাক্ষাৎকার : অরুণাভ সরকার	১০৩
	১৪.৪ সাক্ষাৎকার : আজিজুল হক	১০৮
	১৪.৫ সাক্ষাৎকার : হারুন হাবীব	১১৮

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই এম.ফিল. গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেনকে। তাঁর সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ও উপদেশ আমাকে এমন একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করেছে। গবেষণা কাজের সূচনাতেই তিনি গবেষণা প্রশ্ন নির্ধারণ এবং ঐতিহাসিক ও মৌখিক (Oral History) পদ্ধতিতে কীভাবে কাজ করা যায় সেই বিষয়টি ধরিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া তিনি একজন আদর্শ অভিভাবকের মতো আমাকে গবেষণাকর্মের প্রতিটি পর্যায়ে সাহস জুগিয়েছেন, তথ্যউপাত্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। অভিসন্দর্ভ রচনায় তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে আমাকে এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পথনির্দেশ করেছেন। তার প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেনের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। গবেষণাকর্ম শুরুর প্রাক্কালে গবেষণার বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। অন্যদিকে গবেষণাকর্মের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাজীবন থেকেই উৎসাহিত করে আসছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. এটিএম আতিকুর রহমান। স্যারের অভিভাবকসুলভ উপদেশ এবং দিকনির্দেশনা আমার চলার পথের পাথেয় হয়ে আছে। তার প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই রণাঙ্গনের সাংবাদিক হারুন হাবিবের প্রতি, যুদ্ধকালীন বিভিন্ন স্মৃতিচারণ ও তথ্যউপাত্ত দিয়ে এ গবেষণাকর্মটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য। সাপ্তাহিক স্বাধীনতার সম্পাদক ও প্রবীণ সাংবাদিক অরুণাভ সরকার এবং অগ্রদূত পত্রিকার সম্পাদক আজিজুল হকের প্রতিও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। ইতিহাসনির্ভর এই গবেষণাকর্মটিকে তথ্যগতভাবে সমৃদ্ধ করতে তাদের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষণা কর্মকর্তা মামুন সিদ্দিকী গবেষণা সম্পর্কিত পুস্তক ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমার বাবা আবদুর রাজ্জাক এবং মা মোছাঃ আজিজুন নাহার উৎসাহ দিয়ে সব সময়ের জন্য মানসিক শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া বড় ভাই ড. হাসান মাহমুদ এবং একমাত্র বোন রেজওয়ানা জেবুন রিমার উপদেশ ও দিকনির্দেশনা সহায়তা করেছে কর্মপন্থা নির্ধারণে। আমার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি পাশে থেকে উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছে বন্ধু মাজহারুল ইসলাম রুবেল। এছাড়া এ গবেষণাকর্মের তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন পিয়াস রায়। তার অবদান ধন্যবাদের সঙ্গে স্মরণ করছি। সবশেষে দাফতরিক বিভিন্ন তথ্য ও কার্যকরী সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নূরুল ইসলামকে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

অনেকের মতে ১৯৪৭ সালের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যেই প্রোথিত ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে ধর্মই ছিল একমাত্র সেতুবন্ধন এবং ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও সামাজিক নীতিনির্ধারণের সকল ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক চিন্তার প্রয়োগ ঘটতে থাকে। যদিও ১৯৪৬-৪৭ পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলিম অর্থনৈতিক কারণে পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু দেখা গেল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কাঙ্ক্ষিত মুক্তি অর্জিত হয়নি। উল্টো পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিশেষত পাকিস্তানি এলিটগণ ধর্মকেই শোষণের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। পূর্ববাংলার মুক্তিকামী মানুষের ওপর আসতে থাকে একের পর এক আঘাত। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরই পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালে ঊর্দূকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার তৎপরতা শুরু করে। কিন্তু সেই বাস্তবতাবিবর্জিত ঘোষণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ। রচিত হয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনবদ্য অধ্যায়, ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন। গণদাবির কাছে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সাময়িকভাবে অবদমিত হয়ে ১৯৫৬ সালে গৃহীত সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জাঁতাকল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের তখনও মুক্তি মেলেনি। রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর চলতে থাকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অপরিণামদর্শী শোষণ। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্টি হয় ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী আঞ্চলিক বৈষম্য। অর্থনৈতিক শোষণ, সকল স্তরের প্রশাসনিক পদে দখলদারিত্ব ও রাজনৈতিক অবদমন ক্রমাগত পূর্ব পাকিস্তানকে ঠেলে দেয় বঞ্চনা ও বৈষম্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে। ফলে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপন করেন ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' দাবি। ১৯৬৬ ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপিত শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা, মুদ্রা ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো, রাজস্ব-শুল্ক তথা সরকারি আয়, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন বিষয়ক 'ছয় দফা'র নেপথ্যে ছিল বিগত ১৯ বছরের সর্বব্যাপী শোষণ থেকে মুক্তির বাসনা। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের প্রাণের দাবি 'ছয় দফা' উপেক্ষিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কাছে। ছয় দফা ও ১৯৬৯ এর ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ উত্থাপিত ১১ দফা

দাবির কোনোটিই শাসকগোষ্ঠীর শাসননীতিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আনতে মনযোগী হয়নি। যার ফলে ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙা বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে জন্ম নেয় ১৯৬৯'র গণ অভ্যুত্থান।

কিন্তু তাতেও পরিবর্তন হয়নি পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর শোষণমূলক দুঃশাসনের। নীলনকশা আঁকা হয় ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের। সেই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের সদিচ্ছার অভাব শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে ঠেলে দেয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের দিকে। ১৯৭১ এর মার্চ মাসের ৭ তারিখ বঙ্গবন্ধু ডাক দেন স্বাধীনতার। পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় মুকুটহীন মুজিবের শাসন। ২৫ মার্চ রাতের আঁধারে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হত্যাযজ্ঞ দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামকে রূপান্তরিত করে মুক্তিযুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে ২৬ মার্চ থেকেই শুরু হয় বাঙালির নতুন অভিযাত্রা। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসের এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বাংলার আপামর মানুষের আত্মত্যাগ, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা, বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল অন্যান্য রাষ্ট্রের সহায়তার পাশাপাশি মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকাও ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এদেশের মূল ধারার গণমাধ্যমগুলোর অগ্রণী ভূমিকা পালনের কথা থাকলেও সেগুলো ছিল পাকিস্তান সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই বাস্তবতায় পাঠকের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের চালিকাশক্তি ও মুখপত্র হিসেবে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত হয় অসংখ্য পত্রপত্রিকা। যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকৃত ঘটনা সবার সামনে তুলে ধরা এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ মুক্তিকামী মানুষকে সংগঠিত ও উজ্জীবিত করা। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাসমূহের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। দেশের পাশাপাশি বহির্বিশ্বের সমর্থন আদায়ের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসব পত্রপত্রিকা। এসব পত্রপত্রিকা প্রকাশনার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের জন্য এই কাজটি ছিল সব দিক থেকে দুঃসাহসিক। নানা প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে এসব পত্রিকা কিছুটা অনিয়মিত হলেও প্রকাশিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়জুড়ে।

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো মুক্তিযুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ বাংলাদেশের খবর, নির্যাতন, গণহত্যা, মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছে বস্তুনিষ্ঠভাবে। পাশাপাশি রণাঙ্গনের নানা বিষয়ও বহুমাত্রায় স্থান পেয়েছে এসব পত্রপত্রিকার অগ্নিঝরা পাতায়। লক্ষণীয় যে, পত্রিকাগুলো রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন মতাদর্শের হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে তাদের লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা সংক্রান্ত এসব বিষয় বিশদ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা এই গবেষণার মূল লক্ষ্য।

প্রকাশনা পর্যালোচনা

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণার সংখ্যা কম নয়। কিন্তু সেই তুলনায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করা সংবাদমাধ্যমগুলো নিয়ে গবেষণার সংখ্যা হাতে গোনা। মুক্তিযুদ্ধে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার ভূমিকা নিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থে আলোচনা হয়েছে। এদের কোনোটিতেই পরিপূর্ণভাবে মুক্তিযুদ্ধে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকার বিশদ চিত্র ফুটে ওঠেনি। তন্মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৮২ সালের নভেম্বরে প্রকাশ হয় হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*। পনেরো খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে মুজিবনগরসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর সংবাদ, সম্পাদকীয় সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে অন্যান্য অঞ্চলের পাশাপাশি মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একাধিক পত্রপত্রিকার সুনির্দিষ্ট তথ্য সংযোজন করা হয়েছে– মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় যা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই গ্রন্থে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার অনেককিছুর উল্লেখ নেই। কারণ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর অধিকাংশেরই প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। আর এই গ্রন্থটির সম্পাদনার কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে। তাই মুক্তিযুদ্ধের সাত বছর পর এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার আগেই মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর কিছু দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। এছাড়া গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশের পর বেশ কিছু পত্রপত্রিকার সন্ধান পাওয়া গেলেও

এর কোনো নতুন সংস্করণ প্রকাশ হয়নি বিধায় নতুন করে সন্ধান পাওয়া পত্রপত্রিকাগুলো অনুল্লেখিতই থেকে যায়।

১৯৮৬ সালে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় জাহানারা ইমামের *একাত্তরের দিনগুলি*। গ্রন্থটিতে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকার চিত্র দিনলিপি আকারে আংশিকভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। লেখক মূলত মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকাকালীন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ঢাকা ও তার আশপাশের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির একটি চিত্র ডায়েরি আকারে তুলে ধরেছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার বিষয়ে কোনো আলোকপাত নেই তার এই গ্রন্থে।

২০১০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং মোহীত উল আলম ও আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা* ১৯৭১ গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে ঢাকা শহরে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক নানা তৎপরতা বিশদভাবে উঠে এসেছে। এর মধ্যে আক্কু চৌধুরী ও মোহাম্মদ হাননান রচিত *ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ : দেশ বিদেশের গণমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া* শীর্ষক প্রবন্ধে মুজিবনগরের গণমাধ্যমের প্রতিক্রিয়া শিরোনামে একটি অধ্যায়ে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার বিষয়টি এই গ্রন্থে স্থান পেলেও এ সংক্রান্ত বিস্তারিত কোনো আলোচনা নেই।

২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে অলিয়ঁস ফ্রসেস ডি ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং শিশির ভট্টাচার্য্য অনূদিত ও সম্পাদিত বের্নার-অঁরি লেভির গ্রন্থ *অবিকশিত জাতীয়তাবাদ ও অঙ্কুরে বিনষ্ট বিপ্লবের পটভূমিতে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হচ্ছিল* গ্রন্থটিতে বিশ্ব রাজনৈতিক পটভূমিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে রাজনৈতিক আদর্শ, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ, সাম্যবাদ, মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের আদর্শকেন্দ্রিক অবস্থান ও সাহায্য সংক্রান্ত বিশ্লেষণ উঠে এসেছে। তবে উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো মুক্তিযুদ্ধকালীন ফরাসি দৈনিক *কোঁবা* (ইংরেজি নাম কমব্যাট) এর পক্ষ থেকে সংবাদ আহরণে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের আসা এই সাংবাদিকের রচনার কোথাও মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার বিষয়ে আলোকপাত নেই।

১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে প্রকাশিত ও মঈদুল হাসান রচিত *মূলধারা '৭১* গ্রন্থটি ২২টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এ গ্রন্থটিতে মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও মূল ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার বিবরণের পাশাপাশি লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে প্রাপ্ত বিষয়ও সন্নিবেশিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মূল ঘটনাবলি পর্যায়ক্রমিকভাবে এ গ্রন্থে তুলে ধরা হলেও মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর কোনও উল্লেখ নেই।

নয় খণ্ডে প্রকাশিত *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* গ্রন্থটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর প্রথম তিনটি খণ্ড বাংলাদেশ চর্চা থেকে এবং বাকি ছয়টি খণ্ড অনন্যা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। নয় খণ্ডের প্রায় প্রতিটিতেই মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর বিভিন্ন সংবাদ ও মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত তৎপরতা তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটির তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও নবম খণ্ডে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংবাদ, সম্পাদকীয় উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর সম্পাদকদের মতামত কিংবা অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরা হয়নি। পাশাপাশি মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত এসব পত্রপত্রিকার পাঠকদের মতামতও স্থান পায়নি এই গ্রন্থটিতে। এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার প্রকাশস্থান, সম্পাদকের নাম ও প্রকাশকের নাম বিষয়ক অসম্পূর্ণ তথ্য রয়েছে।

আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সংকলন ও সম্পাদনায় ২০১২ সালের মার্চে ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত হয় *মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জি*। এটি মূলত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সর্বাধিক সংখ্যক বিবরণী একটি গ্রন্থপঞ্জি। মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা বিষয়ে এই গ্রন্থটি সরাসরি কোনো অবদান না রাখতে পারলেও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা প্রকাশনা ও গ্রন্থের নামানুসন্ধানে এই গ্রন্থটি অত্যন্ত সহায়ক।

২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয় আশফাক হোসেন রচিত *মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জন্ম ও জাতিসংঘ* গ্রন্থটি। সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থের 'মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার দৃষ্টিতে জাতিসংঘ' শীর্ষক অধ্যায়ে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত

পত্রপত্রিকাগুলোতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জাতিসংঘের ভূমিকার ওপর সংবাদগুলোর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

২০০১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি) ও দি ব্রিটিশ কাউন্সিল, ঢাকা, বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয় আবু নাসের রাজীবের গবেষণা গ্রন্থ *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বিবিসি*। এগারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গবেষণা গ্রন্থের একমাত্র আলোচ্য বিষয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিবিসির ভূমিকা।

এই গ্রন্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাপ্ত গ্রন্থ ও গবেষণাকর্মগুলোতে প্রাসঙ্গিকভাবে মুক্তিযুদ্ধে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর একটি সামগ্রিক চিত্র কোথাও ফুটে ওঠেনি। তাই মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা বিষয়ে একটি পদ্ধতিগত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে কিছু গবেষণাকর্ম সম্পাদন হয়েছে। তবে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক গণমাধ্যমের আরেকটি বিশেষ শাখা মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো নিয়ে এখন পর্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে: ১৯৭১ সালের মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পত্রিকাগুলোর সামগ্রিক ভূমিকার প্রকৃতি কী ছিল? এসব পত্রপত্রিকা মুক্তিযোদ্ধা, সাধারণ জনগণ এবং সামগ্রিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল? ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের পর থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্যশূন্যতার সময় যুদ্ধের তথ্য পাওয়া দুষ্কর ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে তথ্যশূন্যতা, তা পূরণে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো কতটুকু পূরণে সক্ষম হয়েছিল তার অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর জন্য নানা সূত্রের সহায়তা নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া সত্ত্বেও মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো এখন পর্যন্ত গবেষণার

ক্ষেত্রে অনেকটাই উপেক্ষিত। এমতাবস্থায় মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো রণাঙ্গনের খবর প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল তা তুলে ধরাই এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

কোনো রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তার গণমাধ্যমকে। সমাজ ও জাতি গঠনে এবং দেশ ও দেশের মানুষের যে কোনো সঙ্কট উত্তরণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা বরাবরই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় সরকারি সেন্সরশিপ, নজরদারি ও দমন-নিপীড়নের কারণে ঢাকা থেকে প্রকাশিত মূলধারার পত্রপত্রিকাগুলো (যেমন *ইত্তেফাক, অবজারভার*) মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জোড়ালো কোনো অবস্থান নিতে পারেনি। মূলধারার পত্রিকাগুলো যা করতে পারেনি, নানা চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করে সেই কাজটি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে করতে সমর্থ হয়েছিল মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা। এই পত্রপত্রিকাগুলো সকল প্রকার দমন-নিপীড়ন উপেক্ষা করে দেশের মুক্তিকামী মানুষের কথা বলেছে, তাদের পাশে থেকেছে; সময়ের সাহসী সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাহস জুগিয়েছে; অনুপ্রেরণা দিয়েছে এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠন করে বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন টানা নয় মাস দেশের মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত হয়েছে অনেক পত্রপত্রিকা। এসব পত্রপত্রিকা একদিকে রণাঙ্গনের খবর পরিবেশন করেছে, হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার চিত্র তুলে ধরেছে, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত ও তাদের মনোবল বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব পত্রপত্রিকার সে সময়কার প্রতিটি সংবাদ ও প্রতিবেদনই মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিস্ময়কর হলেও সত্য, এত কম সময়ে বিশ্বের কোথাও কোনো মুক্তিযুদ্ধ যেমন সম্পন্ন হয়নি, তেমনি বিশ্বের কোনো দেশের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এতসংখ্যক পত্রপত্রিকা প্রকাশেরও নজির নেই। তাই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পুনর্গঠনে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত বেশিরভাগ পত্রিকাই ব্যক্তিগত এবং জনগণের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছে।

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি, গণহত্যা, পাকিস্তান সরকার এবং তাদের এদেশীয় দোসর তথা আলবদর, আলশামস ও রাজাকারদের অপতৎপরতা, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মরক্ষার তৎপরতা, মুক্তিযুদ্ধে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি, যুদ্ধকালীন গুজব, মুক্তিযুদ্ধের সময় বহির্বিশ্বের সাহায্য ও সমর্থন, মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয় সংক্রান্ত সংবাদ, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, সংবাদ বিশ্লেষণ ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া পত্রিকাগুলোর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং তাদের আদর্শগত অবস্থানসহ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন ও সমর্থনে এই পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতি

সমগ্র গবেষণাকর্মটিকে নিম্নোক্ত পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়েছে। নিম্নে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ :

এই গবেষণাকর্মের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো তথ্যের দুষ্প্রাপ্যতা। যে কারণে তথ্যের প্রাথমিক সূত্র হিসেবে তৎকালীন কিছু পত্রপত্রিকার সম্পাদক ও পাঠকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হলেও তথ্যের সেকেন্ডারি সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণালব্ধ পুস্তক ও প্রবন্ধ, যা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রকাশনার বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ :

সরাসরি প্রশ্নপূর্বক মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর সম্পাদক ও সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকাশনাটির পরিশিষ্ট অংশে সেই সাক্ষাৎকারের নমুনা প্রশ্ন ও সাক্ষাৎকারগুলো হুবহু সংযোজিত হয়েছে।

৩. গবেষণার বিষয়ে মাঠপর্যায়ে সাধারণ পাঠকের মতামত গ্রহণ :

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো যারা দেখেছেন বা যারা নিয়মিত পাঠক ছিলেন তাদের মতামত মাঠপর্যায়ে গবেষণার (সাক্ষাৎকার) মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪. সংগৃহীত তথ্যউপাত্ত, সাক্ষাৎকার ও মতামত বিশ্লেষণ :

সাক্ষাৎকার তথা মাঠপর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যসমূহ প্রাপ্ত সেকেন্ডারি তথ্যের সাথে যাচাই করা হয়েছে। এসব তথ্য পরে বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনায় ব্যবহার করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫. চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রস্তাবনা আকারে উপস্থাপন :

প্রাথমিক তথ্যসূত্র হিসেবে সংগৃহীত সাক্ষাৎকার, মাঠপর্যায়ে সংগৃহীত পাঠক মতামত, লিখিত আকারে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রাথমিক উৎস এবং সেসব সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সেসব তথ্যের যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সিদ্ধান্তের অবতারণা করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মের উপসংহারে সব অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন

সমগ্র গবেষণাকর্মটিকে নিম্নোক্ত ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজিত করে আলোচনা করা হয়েছে :

অধ্যায় ১ মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার পরিচিতি ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা

এ অধ্যায়ে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে যেসব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর পরিচিতি, প্রকাশক-সম্পাদকের পরিচয় এবং পত্রিকাগুলোর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায় ২ মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় রণাঙ্গনের খবর

মুক্তিযুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর উল্লেখযোগ্য খবর বাছাই করে এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে পত্রিকাসংশ্লিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির অভিজ্ঞতাও তুলে আনা হয়েছে।

অধ্যায় ৩ মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় অবরুদ্ধ বাংলাদেশ, নির্যাতন ও গণহত্যার বিবরণ

এ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ এলাকাগুলোর খবরের কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চালানো নির্যাতন ও গণহত্যা নিয়ে প্রকাশিত খবর এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

অধ্যায় ৪ মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের দিনলিপি

এ অধ্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি, যুদ্ধের সাফল্য, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মতো বিষয়গুলো নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের লেখা ডায়েরি আকারে প্রকাশিত কলামগুলো তুলে আনা হয়েছে।

অধ্যায় ৫ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা

এ অংশে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টির বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে।

অধ্যায় ৬ মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার পাঠকদের মতামত

এ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর কিছু পাঠকের মতামত তুলে আনা হয়েছে।

এই গবেষণাপত্রের শুরু ও শেষে গবেষণাপত্র রচনার প্রাসঙ্গিক নিয়মানুসারে ভূমিকা ও উপসংহারের অবতারণা করা হয়েছে। ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে গবেষণার বিষয়বস্তুকে পর্যায়ক্রমিক যৌক্তিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর পরিচিতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে শুরু করে এতে প্রচারিত সংবাদে মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার পরিচিতি ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল ছিল তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর অন্যান্য রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্রামের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। তবে গভীরতা ও তীব্রতার দিক থেকে যুদ্ধের ঘটনাবলি দ্রুততার সাথে সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধের নানামুখী ক্ষেত্রে মুক্তিকামী বাঙালিরা জড়িয়ে ছিলেন। এর একটি অন্যতম উদাহরণ হলো মুক্তাঞ্চল থেকে অসংখ্য পত্রিকার প্রকাশনা। পৃথিবীর কোনও দেশেই স্বাধীনতাকামী মানুষের মুখপত্র হিসেবে এতো অল্প সময়ে এত পত্রপত্রিকা প্রকাশের নজিরও দেখা যায় না। সময়ের বিচারে মুক্তিযুদ্ধকালীন এসব পত্রপত্রিকার ছিল দ্বিমুখী উদ্দেশ্য। একদিকে দেশের ভেতরের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ। প্রথমত, সচেতনতা ও সংঘবদ্ধকরণের মাধ্যমে দেশের মানুষকে একটি সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার অভিপ্রায় ছিল। দ্বিতীয়ত, দেশের বাইরে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশিদের মাধ্যমে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থন আদায় করাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য। সমকালীন এসব উদ্দেশ্যকে পাশ কাটিয়ে যদি বর্তমানের নিরিখেও চোখ রাখা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন সেসব পত্রপত্রিকা একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রামাণ্য দলিল হিসেবে সাক্ষ্য দিতে সমর্থ হবে। সময়ের পরিক্রমায় তখনকার কিছু সংবাদ আজও কালের সাক্ষী হয়ে অবদান রেখে চলছে দেশের ইতিহাস রচনার।

মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করে *জয় বাংলা* পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক ও মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবিব তার সাক্ষাৎকারে বলেন,

> আমাদের দেশের কাগজ, অবরুদ্ধ বাংলাদেশের যে পত্রপত্রিকাগুলো, যেগুলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা শাসকগোষ্ঠি বাধ্য করেছিল পাকিস্তানের পক্ষে কথা বলতে। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে। এটা একটা কারণ যে আমরা বা মুক্তিযুদ্ধের মানুষ, অনুভব করছিলাম যে আমাদের কিছু কাগজ থাকা উচিত। যে কাগজগুলো আমাদের কথা বলবে। দ্বিতীয়ত, আমরা মনে করেছিলাম বাঙালি জাতি খুব ভাগ্যবান একটা জাতি। আমাদের অসংখ্য বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, সাংবাদিক, লেখক, শিক্ষক, ডাক্তার সীমান্তের ওপারে চলে গেছে। তাদের অবশ্যই একটা অবদান রাখা প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্যে। তখন তারা পরিকল্পনা করলেন পত্রিকার মাধ্যমে মানুষের

> মনোবল ধরে রাখার। সবাই মিলে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী এ পত্রিকাটা বের করার উদ্যোগ নিলেন। তৃতীয়ত কারণটি সম্পূর্ণই রাজনৈতিক। আমরা তখনো জানতাম না যে এ যুদ্ধ ঠিক কতদিন স্থায়ী হবে। কাজেই একটা সাধারণ পত্রিকার মতো করে একটা দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রয়োজন অনুভূত হতে শুরু করল। যে পত্রিকার কাজ হবে দেশের মানুষকে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ও সচেতন করে তোলা। প্রাথমিক দিকে আমরা চিন্তা করেছিলাম যে এ পত্রিকা আমাদের সাধারণ মুক্তিযুদ্ধকামী মানুষের মুখপত্র হয়ে উঠবে।[১]

এ বিষয়ে খানিকটা ভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করে সাপ্তাহিক *স্বাধীনতা*র সম্পাদক অরুনাভ সরকার বলেন,

> মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা অনেকেই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গিয়েছিলাম। ভারতের পত্রপত্রিকা আমাদের এই সমস্যা, আমাদের সঙ্কট খুব ভালোভাবে বুঝতেও হয়তো পারত না। কোনো দেশই পারে না অন্য দেশের চলমান কোনো একটা সমস্যাকে পুরোপুরি আত্মস্থ করতে। কিন্তু তাই বলে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহে ভাটা পড়া সমীচীন হবে না। দেশব্যাপী যুদ্ধের বিষয়গুলোও মানুষকে জানানো খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই প্রয়োজনটা মেটানোর জন্য আমার মতো অনেকেই পত্রিকা প্রকাশের বিষয়ে উদ্যোগী হন। আমি এর আগেও, সীমান্তের ওপারে যাওয়ার আগে এদেশে সাংবাদিকতা করতাম। কাজেই এ কাজটায় আমার অভিজ্ঞতাও ছিল। আমি একা এই কাজটা করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। [২]

ওপরের দুটো উদ্ধৃতিতে মুক্তাঞ্চলের পত্রিকাগুলোর একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি এবং একজন সম্পাদক যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, যুদ্ধরত বাঙালি জনগণের মধ্যে অনুপ্রেরণা তৈরি এবং মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক অবস্থা উপস্থাপনের জন্য পেশাদার ও অপেশাদার অথচ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এসব পত্রিকা প্রকাশ করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে সেসময় বহু সংবাদপত্রের সংবাদ পাওয়া গেলেও উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা কিংবা যত্নের অভাবে তার অনেকগুলোই হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে। বর্তমানে সেই সংখ্যার মধ্যে সামান্য কিছু পত্রিকার বিষয়ে জানতে পাওয়া যায়। গবেষণার এই পর্যায়ে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত সেসব পত্রপত্রিকার বিষয়ে যেসব তথ্যাদি পাওয়া যায় তার একটি বর্ণানুক্রমিক চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

[১] হারুন হাবীব, সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ: ডিসেম্বর ২৮, ২০১৩। পৃ: । হারুন হাবীব, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মুখপত্র *জয় বাংলা* পত্রিকার রণাঙ্গনের নিজস্ব প্রতিবেদক ও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

[২] অরুণাভ সরকার, সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ: ফেব্রুয়ারি ৭, ২০১৪। পৃ: । অরুণাভ সরকার, মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *স্বাধীনতা* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

(১) অমর বাংলা

এবি ছিদ্দিকীর সম্পাদনায় *অমর বাংলা* নামের এই পত্রিকাটি প্রকাশ হতো বেঙ্গল প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস, ঢাকা বাংলাদেশ এর স্বত্বাধিকারী পি,পি, বড়ুয়ার মুদ্রণ ও প্রকাশনায়। বাংলা নামের নিচে ইংরেজিতে Weekly Amor Bangla এবং ট্যাগলাইন হিসেবে 'বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র' লেখা থাকত। পত্রিকার 'মাস্টহেড' এর দুপাশে দুটো আয়তাকার বক্সে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কয়েকটি প্রেরণাদায়ী বক্তব্য লেখা থাকত। চার পৃষ্ঠা ও চারটি কলামসংবলিত পত্রিকাটির মূল্য ছিলো ২৫ পয়সা। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয় ১৯৭১ সালের ৪ নভেম্বর।

(২) অগ্রদূত

রৌমারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আজিজুল হকের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ ঘটে *অগ্রদূত* নামের এই সংবাদপত্রটির। সম্পাদক ছাড়াও পত্রিকাটির সহসম্পাদক পদে মতিয়ুর রহমান, ব্যবস্থাপক পদে সাদাত হোসেন, প্রাদেশিক সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম এবং প্রকাশক ছিলেন মোহাম্মদ আলী। পত্রিকাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জেড ফোর্স কমান্ডার এবং লে. কর্নেল জিয়াউর রহমান। স্বাধীন বাংলার মুক্তাঞ্চলের সাপ্তাহিক মুখপত্র হিসেবে রংপুর জেলাধীন কুড়িগ্রামের রৌমারী পত্রিকাটি হাতে লিখে সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত হতো। ১৯৭১ সালের ৩১ আগস্ট তারিখে যাত্রা শুরু করা পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হিসেবে ডিসেম্বরের ৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৫টি সংখ্যা প্রকাশ করে। পত্রিকাটির মূল্য ছিলো ২০ পয়সা। এর প্রতি সংখ্যায় দুটি করে কলাম প্রকাশিত হতো।

(৩) অভিযান

অভিযান পত্রিকাটি বের হয় কবি ও সাংবাদিক সিকান্দার আবু জাফরের সম্পাদনায়। পত্রিকার নামের নিচে ট্যাগলাইনে লেখা থাকত 'বাঙলাদেশ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র'। পত্রিকাটি প্রকাশের অস্থায়ী ঠিকানা হিসেবে ৮৪/৯, রিপন স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬ লেখা হলেও স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে লেখা হতো ঢাকা। সমকাল মুদ্রায়ণ, ডিআইটি রোড, ঢাকা থেকে এই পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। ৪ থেকে ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকাটি ৩০ পয়সা

মূল্যে পাওয়া গেলেও এর ছাপা যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন ছিলো। ভাষাগত মুনশিয়ানার বিষয়েও পত্রিকাটির দক্ষতা লক্ষণীয়। ১৯৭১ সালের ১৮ নভেম্বর পত্রিকাটি প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয়।

(৪) আমার দেশ

খাজা আহমদের সম্পাদনায় *আমার দেশ* সাপ্তাহিকটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে সে সময়। বাংলাদেশের কোনও এক অজ্ঞাত (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) মুক্তাঞ্চল থেকে *আমার দেশ* মুদ্রণালয় থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো বলে পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হতো। ৬ পৃষ্ঠার পত্রিকাটিতে ৩টি কলাম ছাপা হতো। ২৫ পয়সা মূল্যমানের এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৭১ এর আগস্ট মাসের শেষদিকে। মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক কলেবরের এই পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের খবর, হানাদার বাহিনীর পরাজয় ও মুক্তাঞ্চলের খবরকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে প্রকাশ করা হতো।

(৫) আমোদ

মোহাম্মদ ফজলে রাব্বীর সম্পাদনায় কুমিল্লার চৌধুরীপাড়া থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *আমোদ* । ১৯৫৫ সালের ৫ মে থেকে প্রকাশনায় থাকা এই সাপ্তাহিকটির বিস্তার মূলত ছিল কুমিল্লা, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, চাঁদপুর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায়। প্রথমে ক্রীড়া সাপ্তাহিক হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও পরে সাধারণ সাপ্তাহিক হিসেবে পথচলা শুরু করে *আমোদ*। একাত্তরে বাংলাদেশ অবরুদ্ধ থাকার প্রাক্কালে এর মোট আটটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত পত্রিকাটির নামের নিচে ইংরেজিতে *THE AMOD* লেখা থাকত। এর সম্পাদকীয়গুলো ছিলো অরাজনৈতিক ও সাধারণ বিষয়নির্ভর। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সরাসরি কাজ করা সম্ভব না হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতাবিরোধী চক্রকেও উৎসাহিত করেনি সাপ্তাহিক আমোদ। পশ্চিম পাকিস্তানি চাপের কারণে সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে অনেক যুদ্ধভিত্তিক বিষয়কে উপেক্ষা করা হলেও কোনো মতেই স্বাধীনতাবিরোধী মতাদর্শকে স্থান দেয়া হয়নি আমোদের পাতায়।

(৬) অগ্নিবাণ

ঢাকা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় *অগ্নিবাণ*। এই এলাকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (মোজাফফর)

কেন্দ্রীয় নেতা ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী পত্রিকাটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে জানা যায়। পত্রিকা পরিচালনার উপদেষ্টা পরিষদে আব্দুল মতিন চৌধুরী, আব্দুর রউফ খান, নরেশ চন্দ্র চৌধুরী, আব্দুর রশীদ খান, মোবারক হোসেন লুডু, হায়াত আলী মিয়া, গোলাম মহিউদ্দিন ছানা, মোঃ শাহজাহান চৌধুরী, নাসিমা সুলতানাসহ আরও অনেকে যুক্ত ছিলেন।

(৭) ইশতেহার

নওগাঁর সংগ্রামী তরুণদের উদ্যোগে স্বাধীন বাংলার প্রথম দৈনিক পত্রিকা হিসেবে *ইশতেহার* এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ২৭ মার্চ প্রথম বের হওয়া এই পত্রিকাটির মাত্র দুটি সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সংখ্যাটি বের হয় পরদিন অর্থাৎ ২৮ মার্চ। ফুলস্কেপ কাগজে সাইক্লোস্টাইল করা এই পত্রিকার নেপথ্যে কে বা কারা ছিলেন কারও নামই প্রকাশনায় ছিল না। তবে এর প্রকাশনার সঙ্গে শফিক খান, মইনুল ইসলাম, আনিসুর রহমান, আজিজুল হক, আফম আলমগীর, আখতার সিদ্দিকী, জহুরুল ইসলাম ইদুল, খায়রুল আলম প্রমুখ ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতার তথ্য জানা যায়।

(৮) উত্তাল পদ্মা

মুহাম্মদ আবু সাহিদ খানের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক *উত্তাল পদ্মা* পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ। রোশেমা বেগম কর্তৃক উত্তাল পদ্মা প্রেস, মুজিবনগর হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় এই সংবাদপত্রটি। ২৪ নভেম্বর, ১৯৭১ এ পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ২৫ পয়সার ৬ পৃষ্ঠার এই সংবাদপত্রে ৭টি কলাম প্রকাশিত হতো। ঝকঝকে ছবি ও ছাপার ব্যাপারে পত্রিকাটির সুনাম ছিল। বাংলাদেশে উত্তাল পদ্মা প্রেস, মুজিবনগর, বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতে ১১৮, ইলিয়ট রোড, কলিকাতা ১৬ কে. যোগাযোগের ঠিকানা হিসেবে মুদ্রিত থাকত।

(৯) ওরা দুর্জয় ওরা দুর্বার

মুক্তিবাহিনীর ক্রোড়পত্র *ওরা দুর্জয়, ওরা দুর্বার* বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রচার দফতরের পক্ষ থেকে এম আর আখতার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সচিত্র ক্রোড়পত্রটির কলাম সংখ্যা ছিল ৩। প্রথম সংখ্যা ও অন্যান্য তথ্যাদি জানা যায়নি।

(১০) গণমুক্তি

গণমুক্তি পত্রিকার নামের শিরোনামের ওপরে লেখা হতো স্বাধীনতাকামী ও মেহনতি জনগণের সাপ্তাহিক মুখপত্র। মওলানা ভাসানী এই পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেন। পত্রিকার নামের পাশে দু'দিকে দুটো বাক্সে মওলানা ভাসানীর বিভিন্ন উদ্ধৃতি ছাপা হতো। ১ নভেম্বর ১৯৭১-এ পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ৪ পাতার এই পত্রিকার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ১০ পয়সা।

(১১) গ্রেনেড

সাপ্তাহিক সংবাদ *গ্রেনেড* প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকারই কোনো এক অজ্ঞাত স্থান থেকে। নটরডেম কলেজের সাইক্লোস্টাইল মেশিনটি উঠিয়ে এনে ঢাকা শহরেরই কোনও একটি অজ্ঞাত স্থানে স্থাপন করে তরুণ ছাত্রকর্মীদের উদ্যোগে প্রকাশিত হতো এই সংবাদপত্রটি। বিচ্ছু বাহিনী নামের এই বাহিনী সশস্ত্র লড়াইয়ের পাশাপাশি সাপ্তাহিক প্রকাশনা *গ্রেনেড* এর মাধ্যমেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

(১২) জয়বাংলা (১)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিয়মিত সাপ্তাহিক মুখপত্র ছিলো এই পত্রিকাটি। *জয়বাংলার* সম্পাদক হিসেবে গণপরিষদ সদস্য আহমদ রফিকের নাম ব্যবহার করা হতো। যদিও তিনি পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না বলে জানা যায়। পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মতিন আহমদ চৌধুরী। মুজিবনগর জয়বাংলা প্রেস থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো জয়বাংলা। এর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ এর ১১ মে। ২০ পয়সা মূল্যের পত্রিকাটি ৩য় সংখ্যা থেকে ২৫ পয়সা মূল্য ধার্য করা হয়। এতে ঝকঝকে ট্যাবলেয়েড সাইজের পত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হতো। মুজিবনগর থেকে এর ৩৪টি প্রকাশিত সংখ্যায় ২ থেকে ৪টি নিয়মিত কলাম প্রকাশিত হতো। ১৯৭১ সালের ২৪ ডিসেম্বর এর সর্বশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। যোগাযোগের ঠিকানা হিসেবে বর্ণিত ছিল কর্মাধ্যক্ষ, সাপ্তাহিক জয়বাংলা, হেড অফিস, মুজিবনগর, বাংলাদেশ অথবা তথ্য, গণযোগাযোগ ও প্রচার বিভাগ, বাংলাদেশ মিশন ৯, সার্কাস এভিনিউ, কলিকাতা ১৭।

(১৩) জয় বাংলা (২)

ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেডের কর্মকর্তা জনাব এমজি হায়দার 'রহমতউল্লা' নাম ধারণ করে এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথমে দৈনিক ও পরে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয় *জয় বাংলা* নামের এই পত্রিকা। নওগাঁ থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির কোনও রাজনৈতিক আনুগত্য ছিল না। সীমিত পুঁজিনির্ভর করে চলা এই পত্রিকাটির কোনো অর্থসাহায্যের প্রয়োজন হয়নি। শুধু কাগজ আর মুদ্রণ খরচের জন্য প্রতি সংখ্যার মূল্য ধার্য করা হয়েছিল ১০ পয়সা। শেষ সংখ্যা পর্যন্ত বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় পত্রিকাটির সব সংখ্যা। ১৯৭১ এর ৩০ মার্চ প্রথম প্রকাশ হওয়া সংবাদপত্রটির মোট ১১টি সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

(১৪) জয় বাংলা (৩)

জয় বাংলা নামের এ পত্রিকাটির নামের নিচে 'স্বাধীন বাংলার স্বাধীন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র' এবং বন্ধনীতে আবদ্ধ 'মুক্তিফৌজ কর্তৃক প্রচারিত' বাক্যগুলো লিপিবদ্ধ থাকত। মুক্তিফৌজ কর্তৃক স্বাধীন বাংলা প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত এই পত্রিকাটির মূল্য ধরা হয়েছিল ২০ পয়সা। ২ পৃষ্ঠার এই পত্রিকায় ৪টি করে কলাম প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল।

(১৫) জয় বাংলা (৪)

সাংবাদিক ও কলামিস্ট আব্দুল বাসিত *জয় বাংলা* পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। সাপ্তাহিক এই পত্রিকার শিরোনামের নিচে 'স্বাধীন বাংলার সিলেট জেলার মুখপাত্র' কথাটি লেখা থাকত। অবশ্য খুব বেশিদিন পত্রিকাটি চলতে পারেনি নানাবিধ কারণে।

(১৬) জন্মভূমি

১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম ঢাকায় প্রকাশিত হয় *জন্মভূমি* পত্রিকাটি। সাপ্তাহিক এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোস্তাফা আল্লামা। ঢাকায় এর ৫টি সংখ্যা বের হওয়ার পর ১৬ জুলাই ১৯৭১ হতে কলকাতা থেকে এর প্রচার পুনরায় শুরু হয়। সম্পাদক তার ব্যবসালব্ধ অর্থে পত্রিকাটি পরিচালনা করতেন বলে জানা যায়। সম্পাদক নিজেই ছিলেন এর সংবাদ সংগ্রহকারী, লেখক, প্রুফরিডার ও সার্কুলেশন

ম্যানেজার। পত্রিকাটির স্লোগান ছিল 'বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণের বিপ্লবী মুখপত্র'। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে পত্রিকাটি নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর না হওয়ায় অনিয়মিতভাবেই চলে এর প্রকাশনা। জন্মভূমি প্রেস এন্ড পাবলিকেশনের পক্ষে মোস্তফা আল্লামা কর্তৃক রবীন্দ্র এভিনিউ ও মুজিবনগর বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত এই পত্রিকা লন্ডন থেকেও প্রকাশিত হতো। জুলাই থেকে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ত্রিশটি সংখ্যা প্রকাশ হয় পত্রিকাটির। ২ থেকে ৪ পৃষ্ঠার কলেবরে পত্রিকাটিতে ৫টি কলাম ও সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হতো দুই রঙে। এর মূল্য ছিল বাংলাদেশে ৩০ পয়সা ও লন্ডনে ২ শিলিং। পত্রিকাটিতে রাজনৈতিক নিবন্ধ ও বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হতো।

(১৭) জাগ্রত বাংলা

এই পত্রিকার সম্পাদক 'বাঙ্গালী' ছদ্মনামে পত্রিকাটির সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পত্রিকার নাম *জাগ্রত বাংলার* নিচে ইংরেজি হরফে THE JAGRATA BANGLA লেখা থাকত। পত্রিকার কোনোটিতে 'মুক্তিফৌজের সাপ্তাহিক মুখপত্র', আবার কোনোটিতে 'মুক্তিবাহিনীর সাপ্তাহিক' ট্যাগলাইন হিসেবে লেখা থাকত। পত্রিকাটি হাতে লেখা হতো এবং সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত হতো। ময়মনসিংহ সদর দক্ষিণ মুক্তিফৌজের বেসামরিক দফতর, ময়মনসিংহ সদর দক্ষিণ ভালুকা শাখা মুক্তিফৌজের বেসামরিক দফতর আজাদনগর, ময়মনসিংহ জেলা বেসামরিক দফতর আজাদনগর এবং ময়মনসিংহ জেলা ও উত্তর ঢাকার বেসামরিক দপ্তর আজাদনগর থেকে প্রকাশিত হিসেবে বেশ কয়েকটি প্রকাশনাস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় পত্রিকাটির বিভিন্ন সংখ্যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে নানান স্লোগান ও বাণী ছাপা হতো পত্রিকাটির বিভিন্ন অংশে। ৬ থেকে ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির মূল্য নির্ধারণ করা হয় ৩০ পয়সা। এতে কলাম সংখ্যা প্রথমে ২ হলেও পরে তা ৩-এ উন্নীত হয়। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭১-এর ১ জুন।

(১৮) জাতীয় বাংলাদেশ

এএমএম আনোয়ারের সম্পাদনায় প্রকাশিত *জাতীয় বাংলাদেশ* পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ করা হয় ১৯৭১-এর মার্চ মাসে। শেখ মোহাম্মদ শহীদ আনোয়ার কর্তৃক বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল থেকে প্রকাশিত ও শেখ নি প্রেস নোয়াখালী বাঙলাদেশ থেকে মুদ্রিত হয় পত্রিকাটি। চার পাতার এই পত্রিকাটির মূল্য ছিল ১৫ পয়সা ও এতে প্রকাশিত কলামের সংখ্যা ছিল ৫। পত্রিকাটির বিদেশ শাখা হিসেবে ২৮৯/এফ/৬, দরগা রোড, কলকাতা

১৭, শ্রী পরিমল সাহা, ডাকবাংলো রোড, উদয়পুর, পো ঃ রাধাকিশোরপুর, ত্রিপুরা, এম এম হোসেন, ৫৯, ফ্যাশন স্ট্রিট, লন্ডন ই-১ বিবিধ ঠিকানা মুদ্রিত হতো।

(১৯) দাবানল

দাবানল নামের এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির স্লোগান 'মুক্তিযোদ্ধা ও সংগ্রামী জনতার মুখপত্র'। সম্পাদক ছিলেন মোঃ জিনাত আলী। ত্রিবর্ণ প্রকাশনীর পক্ষে মোঃ সেলিম কর্তৃক মুদ্রিত প্রকাশিত এবং মুজিবনগর হতে প্রচারিত হতো পত্রিকাটি। ৬ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৭১ এর সেপ্টেম্বর মাসে।

(২০) দুর্জয় বাংলা

দুর্জয় বাংলা সাপ্তাহিকটি তুষার কান্তি কর সম্পাদনা করতেন। পত্রিকার নামের নিচে ট্যাগলাইন লেখা থাকতো 'সংগ্রামী বাংলার কণ্ঠস্বর'। সিলেট সুরমা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে তুষার কান্তি কর কর্তৃক বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত এটি। বিদেশের ঠিকানা হিসেবে ছিল রফিকুল রহমান, পুরাতন স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ। বিভিন্ন সময় ১০ থেকে ২৫ পয়সা পর্যন্ত বিভিন্ন দামে পত্রিকাটি বিক্রয় হতো।

(২১) দেশ বাংলা

ফেরদৌস আহমদ কোরেশী *দেশ বাংলা* পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। সাপ্তাহিক পত্রিকাটি দীপক সেন কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল থেকে মুদ্রিত ও অগ্নিশিখা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে বিজয়নগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। যোগাযোগের ঠিকানা হিসেবে পত্রিকাটিতে মুদ্রিত হতো দেশ বাংলা কার্যালয়, বিজয়নগর, ঢাকা-২, সত্যরঞ্জন দেব, ৩, হায়াৎ খান লেন, কলিকাতা ৯, সফিউল আলম বেবী, প্রযত্নে ঝর্ণা বুক এজেন্সি, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা। শম্ভু পাল প্রযত্নে কবরী চৌধুরী গান্ধী নগর, ইস্ট বান্দ্রা, বোম্বাই। ঝকঝকে ছাপার পত্রিকাটির মূল্য নির্ধারণ করা হয় ২০-৩০ পয়সা। ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকায় ৫টি কলাম প্রকাশিত হতো। ২৭ অক্টোবর থেকে প্রকাশ শুরু হওয়া পত্রিকাটি প্রতি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হতো।

(২২) ধুমকেতু

পিরোজপুর থেকে প্রকাশিত হয় অর্ধসাপ্তাহিক *ধুমকেতু*। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন অমর সাহা। স্বাধীনতার পরে এটি জনমত নামে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

(২৩) নতুন বাংলা

নতুন বাংলা পত্রিকার নামের নিচে বন্ধনীতে 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাপ্তাহিক মুখপাত্র' লেখা হতো। এতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সভাপতি কর্তৃক বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত লেখা থাকত। ৪ পাতা ও ৪ কলাম সংখ্যার এই পত্রিকার দাম ১০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছিল। ১৯ জুলাই ১৯৭১ এর প্রথম প্রকাশ হয় এবং ১৯তম সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশনা অব্যহত থাকে।

(২৪) প্রতিনিধি

আহমেদ ফরিদউদ্দিনের সম্পাদনায় *প্রতিনিধি* সাপ্তাহিকটি বাংলাদেশেরই অজ্ঞাত কোনো স্থান থেকে প্রকাশিত হতো। পত্রিকার নামের নিচে ট্যাগলাইন 'স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র' লেখা থাকত। রক্তলেখা ছাপাখানা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো পত্রিকাটি। প্রথম প্রকাশকাল নিশ্চিত না হওয়া গেলেও ১৫ অক্টোবর এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের তথ্য সুনিশ্চিতভাবে জানা যায়।

(২৫) বঙ্গ বাণী

বঙ্গ বাণী স্বাধীন বাংলার সাপ্তাহিক মুখপত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। পত্রিকাটি নওগাঁ থেকে প্রকাশিত হতো। পত্রিকটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাত এমএ জলিল এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কেএম হোসেন (খন্দকার মকবুল হোসেন) এবং সহ-সম্পাদক ছিলেন এবি খোন্দকার। পত্রিকাটিতে নওগাঁসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধ ও মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধের সফলতার কথা তুলে ধরে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সাহসী করা হতো। ৪ পৃষ্ঠা ও ৩ কলামের পত্রিকাটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৫ পয়সা। প্রথম প্রকাশকাল ২৩ মে, ১৯৭১।

(২৬) বাংলার কথা

ওবায়দুর রহমান সম্পাদিত সাপ্তাহিক *সোনার বাংলা*র দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ১৯৭১ এর ১ সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় সংখ্যায় এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় *বাংলার কথা*। পত্রিকাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক এএইচএম কামরুজ্জামান (হেনা), স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নাম উল্লেখ করা হয় এবং বার্তা সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন শহিদুল হক। বাংলাদেশ সরকারের নিবন্ধনপ্রাপ্ত পত্রিকাটিতে ৮ পৃষ্ঠা ও ৪ কলামে সংবাদ পরিবেশিত হতো। মূল্য নির্ধারণ করা হয় ২৫ পয়সা।

(২৭) বাংলার বাণী

স্বাধীনতাযুদ্ধকালীন অন্যতম সুসম্পাদিত ও সুচিন্তিত সাপ্তাহিক পত্রিকা এই *বাংলার বাণী*। ১৯৭০ সালে হাফেজ হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয়। মুজিবনগর থেকে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয় ১৯৭১ এর ১ সেপ্টেম্বর। ভারতে এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতেন আমির হোসেন। ৮ পৃষ্ঠার এই সাপ্তাহিকটি ৩০ পয়সায় বিক্রয় হতো। পত্রিকাটি স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার একটি সংবাদপত্র হিসেবে সুপরিচিত ছিল সে সময়।

(২৮) বাংলার ডাক (১)

সম্পাদক দীপক রায় চৌধুরী ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ইউসুফ আলী এবং কার্যকরী সম্পাদক দুলাল কুমারের তত্ত্বাবধানে *বাংলার ডাক* প্রকাশিত হয় মুজিবনগর থেকে। কিন্তু প্রথম সংখ্যাটি কবে প্রকাশিত হয় তা সঠিক জানা যায়নি। পত্রিকার নামের নিচে লেখা থাকত 'রক্তাক্ত বাংলার সাপ্তাহিক মুখপাত্র'। ২ কলামে উপস্থাপিত এই সংবাদপত্রটির মূল্য ছিল ২০ পয়সা।

(২৯) বাংলার ডাক (২)

সুশীল সেনগুপ্তের সম্পাদনায় *বাংলার ডাক* প্রকাশিত হতো। আঙ্গিকে তেমন একটা আকর্ষণীয় ছিল না এই পত্রিকাটি। এই সাপ্তাহিকীটিতে সংবাদ পর্যালোচনার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের টুকটাক খবর প্রকাশিত হতো।

(৩০) বাংলার মুখ

ছিদ্দিকুর রহমান আশরাফীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো সাপ্তাহিক পত্রিকা *বাংলার মুখ*। এটি রঞ্জিনা প্রকাশনীর পক্ষে ছিদ্দিকুর রহমান আশরাফী কর্তৃক পলাশ আর্ট প্রেস মুজিবনগর বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ৫ কলাম ও ৪ থেকে ৮ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রিকাটির মূল্য নির্ধারিত হয় ২৫ পয়সা। ১৯৭১ সালের ১৩ আগস্ট প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় এই পত্রিকাটির। এর ত্রিপুরা ও ভারতের পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগের অফিস ছিল দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, ত্রিপুরা। কলকাতা অফিস ছিল ৩২/এ, পাটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯ এবং স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে ছিল মুজিবনগর, বাংলাদেশ।

(৩১) বাংলাদেশ (১)

মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে প্রতি সপ্তাহে *বাংলাদেশ* নামে একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হতো। পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে আবুল হাসান চৌধুরী এবং প্রকাশক হিসেবে আব্দুল মমিনের নাম ছাপা হতো। বাস্তবে এই দুটি কাজই একসঙ্গে করতেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুল মান্নান চৌধুরী। পত্রিকাটির প্রকাশনাস্থল হিসেবে ব্যবহার হতো বাংলাদেশ প্রেস, রমনা, ঢাকা, বাংলাদেশ। যদিও পত্রিকাটি শুরুতে সোনামুড়া থেকে ও পরে আগরতলা থেকে প্রকাশ হতো। এটি ছিল পূর্বাঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের একমাত্র মুখপত্র।

(৩২) বাংলাদেশ (২)

শেখ আব্দুর রহমানের সম্পাদনা ও ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম সম্পাদক সালেহা বেগম ও রনজিৎ দাস কর্তৃক *বাংলাদেশ* পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নামের নিচে ট্যাগলাইনে লেখা থাকত 'রক্তসূর্য উঠেছে, বীর বাঙালী জেগেছে' এ কথাগুলো। প্রথম সংখ্যার বিষয়ে খোঁজ না পাওয়া গেলেও এর দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশকাল ১৯৭১ এর ১৫ জুন। ১০ পয়সা মূল্যমানের পত্রিকাটিতে ২ কলামে সংবাদ ও প্রবন্ধাদি সজ্জিত থাকত।

(৩৩) বাংলাদেশ (৩)

বরিশাল থেকে প্রকাশিত *বাংলাদেশ* পত্রিকা ছিল একটি অনিয়মিত অর্ধসাপ্তাহিক সংবাদপত্র। এটি সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন এসএম ইকবাল, মিন্টু বসু, হেলালউদ্দিন এবং প্রকাশনায় হারেচ এ খান, এনায়েত হোসেন, মুকুল দাস। ১৯৭১ এর ১৭ এপ্রিল পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দুই পাতার পত্রিকাটির মূল্য নির্ধারিত ছিল ১৫ পয়সা। একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশের পরপরই পত্রিকাটির প্রচার বন্ধ হয়ে যায় বিমান হামলা ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞে।

(৩৫) বাংলাদেশ (৫)

আব্দুল মতিন চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রবাসী সরকারের জালালাবাদ আঞ্চলিক তথ্য ও জনসংযোগ দফতর থেকে প্রকাশিত হতো *বাংলাদেশ* নামের এই সাপ্তাহিক প্রকাশনা। প্রথমে পাক্ষিক হলেও পরে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় পত্রিকাটি।

(৩৬) বাংলাদেশ (৬)

কাজী মাজহারুল হুদার সম্পাদনায় ৭ এপ্রিল থেকে *দৈনিক বাংলাদেশ* নামে পত্রিকাটি দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও থেকে প্রকাশ শুরু হয়। বঙ্গশ্রী প্রেস ঠাকুরগাঁও হতে কাজী আব্দুর রহমান কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় এ পত্রিকা। পত্রিকাটির নামের নিচে ট্যাগলাইন হিসেবে 'স্বাধীন বাংলার স্বাধীন সংবাদপত্র' লেখা থাকত। ৩-৪ কলাম বিশিষ্ট এই পত্রিকার বিনিময় মূল্য ছিল ১৫ পয়সা। ৭ এপ্রিল থেকে প্রকাশ শুরু করে মোট ছয়টি সংখ্যা প্রকাশ করে 'বাংলাদেশ' নামের এই পত্রিকাটি। পরে তেঁতুলিয়া মুক্তাঞ্চল থেকে এর আরও ৪টি সংখ্যা প্রকাশ হয় ১৮ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত।

(৩৭) বাংলাদেশ (৭)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে বহিঃপ্রচার বিভাগ থেকে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে প্রকাশিত হতো *বাংলাদেশ* নামের এই বুলেটিন। ফেরদৌস মুরশিদের সম্পাদনায় এই

পত্রিকার উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত ছিলেন মওদুদ আহমদ। এই বুলেটিন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।

(৩৮) বাঙলাদেশ

আমিনুল হক বাবুর প্রতিষ্ঠায় ও যুগ্ম সম্পাদক অমল চন্দ্র পালের তত্ত্বাবধানে *বাঙলাদেশ* পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার নামের নিচে ইংরেজি হরফে (THE BANGLADESH) ছাপা হতো। পত্রিকাটি অমিয় কুমার ঝুনু কর্তৃক আদর্শ ছাপাখানা (বাঙলাদেশ) থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত হতো। চার পাতার এই পত্রিকার মূল্য ছিল ১৫ পয়সা। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে পত্রিকাটি প্রচার শুরু করে বলে জানা যায়।

(৩৯) বিপ্লবী বাংলাদেশ

সাপ্তাহিক *বিপ্লবী বাংলাদেশ* এর সম্পাদক ছিলেন নুরুল আলম ফরিদ। বরিশাল থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটিতে সহসম্পাদক সন্তোষ কুমার চৌধুরী, বার্তা সম্পাদক মিঠু বসু, রণাঙ্গন প্রতিনিধি ফরিদুল ইসলাম এবং আলোকচিত্র প্রতিনিধি মহঃ তৌফিক ইমাম কর্মরত ছিলেন। এটি মহম্মদ ইউসুফ নাহিদ কর্তৃক চাঁপা প্রেস, বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত ও রফিক হায়দার রবিন কর্তৃক প্রকাশিত ছিল। পত্রিকাটির নামের নিচে ইংরেজীতে *Biplabi Bangladesh* লেখা ছাড়াও 'জনগণের নির্ভীক কণ্ঠস্বর' পত্রিকার নামের ওপরে লেখা ছিল। ৪ আগস্ট ১৯৭১ এ প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর থেকে মোট ১৯টি সংখ্যা প্রকাশ করে পত্রিকাটি। সর্বশেষ সংখ্যাটির প্রকাশকাল ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। ট্যাবলয়েড সাইজের পত্রিকাটিতে ৪ থেকে ৬টি পৃষ্ঠা থাকতো যেখানে ৪-৫টি কলামে সংবাদ সুবিন্যস্ত থাকত। মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে পত্রিকাটির বিশেষ একটি সুনাম ছিল।

(৪০) মায়ের ডাক

মায়ের ডাক প্রেস, মুজিবনগর থেকে মুদ্রিত এবং শ্রীমতী নীলিমা দে কর্তৃক প্রকাশিত *মায়ের ডাক* পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন সালেহা বেগম। পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য শেখ আব্দুর রহমান। পত্রিকাটির প্রধান কার্যালয় ছিল মুজিবনগর, বাংলাদেশ। এছাড়া খুলনা,

বাগেরহাট, কলকাতা, ২৪ পরগনাও আঞ্চলিক দফতরের ঠিকানা হিসেবে উল্লেখ করা হতো পত্রিকাটিতে। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশকাল নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশ পায় ২২ অক্টোবর ১৯৭১। ১৫ পয়সা মূল্যের পত্রিকাটি ৪ পৃষ্ঠায় ৫ কলামে প্রকাশ হতো। স্বাধীনতার পর বাগেরহাটে আঞ্চলিকভাবে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশ করা হয়েছিল।

(৪১) মুক্ত বাংলা (১)

সিলেট জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের মুখপত্র ছিল *মুক্ত বাংলা*। পত্রিকার নামের নিচে বন্ধনীতে *MUKTO BANGLA*, The weekly mouth piece of the liberaion movement of Bangladesh, Sylhet District Zone লেখা থাকত। পত্রিকাটির সভাপতি ও পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন সিলেট জেলা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আবুল হাসনাত সাআদত খান। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন সিলেট জেলার সাহিত্যিক আকাদ্দস সিরাজুল ইসলাম। পত্রিকাটি আবুল হাসনাত কর্তৃক সিলেট জেলার মুক্তবাংলা প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এছাড়া পত্রিকাটি ভারত থেকেও প্রকাশ হতো। ২০ পয়সার পত্রিকাটিতে ৪ পৃষ্ঠায় ৪ কলামে সংবাদ সন্নিবেশিত হতো। মুক্তবাংলার উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিসংগ্রামে সিলেট জেলার ভূমিকাকে যথাযোগ্যভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরা। প্রথম প্রকাশকাল ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

(৪২) মুক্ত বাংলা (২)

মুক্ত বাংলা পত্রিকার সম্পাদকের নাম সাঙ্কেতিকভাবে 'দ-জ' লেখা হতো। শুধু সম্পাদকই নয়, প্রকাশকের নাম ও ঠিকানাও গোপন রাখা হতো মুক্ত বাংলা পত্রিকার। ধারণা করা হয় পাকিস্তানি সেনা অধ্যুষিত কোনো অঞ্চল থেকে সাইক্লোস্টাইলে এক পাতার এই খুদে পত্রিকা বের হতো। পুরো পত্রিকায় এর প্রকাশক হিসেবে শুধু মুক্তবাংলা প্রকাশনী, বাংলাদেশ লেখা হতো ঠিকানায়।

(৪৩) মুক্তি (১)

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক মাসিক সাহিত্যপত্র ছিল *মুক্তি*। এর সম্পাদক ছিলেন শরিফউদ্দীন আহমেদ। প্রদীপ্ত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত এই সাহিত্য সাময়িকীটি অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকেই সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত হতো। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১ কার্তিক ১৩৭৮।

(৪৪) মুক্তি (২)

সাহাবুদ্দিন খানের সম্পাদনায় ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের ২ অগ্রহায়ণ পাক্ষিক সাময়িকী *মুক্তির* আত্মপ্রকাশ ঘটে। পত্রিকাটি সাইক্লোস্টাইলের মাধ্যমে ঢাকার আড়াইহাজার থেকে প্রকাশিত হতো।

(৪৫) মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র। এতে সম্পাদকের নাম সাঙ্কেতিকভাবে ব্যবহার করে প্রকাশকের নাম-ঠিকানা গোপন রাখা হতো। পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত ও মুক্তিযুদ্ধ প্রেস বাঙলাদেশ হইতে মুদ্রিত–এমন তথ্য পত্রিকাতে লিপিবদ্ধ হতো। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭১-এর জুলাইতে। ১০ পয়সা দামের পত্রিকাটিতে ৫ কলামে ও দুই রঙে সংবাদ পরিবেশন করা হতো। এতে যুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক সংবাদের পাশাপাশি সুচিন্তিত বিশ্লেষণাত্মক নিবন্ধও প্রকাশ করা হতো।

(৪৬) রণাঙ্গন (১)

ছদ্মনাম 'রণদূত' হিসেবে সম্পাদকের পরিচয় দেয়া হতো *রণাঙ্গন* পত্রিকায়। সহযোগী সম্পাদনায় ছিলেন ফারুক আহমেদ। পত্রিকার নামের নিচে ট্যাগলাইন হিসেবে শোভা পেত 'মুক্তিফৌজের সাপ্তাহিক মুখপত্র' কিংবা 'মুক্তিবাহিনীর সাপ্তাহিক মুখপত্র'। হাতে লিখে সাইক্লোস্টাইল করা পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৭১-এর ১১ জুলাই। টাঙ্গাইল জেলা মুক্তিফৌজের বেসামরিক দফতর থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদের সিদ্দিকী। বিভিন্ন রণাঙ্গনের খবরের কাহিনীর পাশাপাশি কাদের সিদ্দিকী বাহিনীর বীরত্বের বিষয়টি এই পত্রিকায় প্রাধান্য পেতো।

(৪৭) রণাঙ্গন (২)

মুস্তাফা করিম কর্তৃক সম্পাদিত সাপ্তাহিক *রণাঙ্গন* পত্রিকাটি প্রকাশ হতো বাংলাদেশের অন্যতম মুক্তাঞ্চল পাটগ্রাম থেকে। পত্রিকার নামের ওপর 'মুক্তিকামী জনতার মুখপত্র' কথাটি লেখা হতো। ১৫ পয়সা মূল্যের পত্রিকাটিতে ৩-৪ কলামে সংবাদ উপস্থাপন করা হতো। এই পত্রিকায় প্রধান উপদেষ্টা মতিয়র রহমান এমএনএ, প্রধান পৃষ্ঠপোষক করিম উদ্দিন আহমেদ এমপিএ, যুগ্ম সম্পাদক এমএ সালেহ ও সুভাষ চন্দ্র নন্দী এবং সার্কুলেশন ম্যানেজার হিসেবে এম এ করিম নিযুক্ত ছিলেন।

(৪৮) রণাঙ্গন (৩)

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন রংপুর থেকে প্রকাশিত পত্রিকার একটি ছিল *রণাঙ্গন*। এর মুদ্রণ মূলত হতো ভারতে। সেখানে থেকেই বিভিন্ন পথে তা পৌঁছে দেয়া হতো রংপুরের অবরুদ্ধ বাংলাদেশী পাঠকদের হাতে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন খন্দকার গোলাম মোস্তফা বাটুল।

(৪৯) লড়াই

লড়াই পত্রিকাটি মুক্তাঞ্চল থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। কিন্তু এর কোথাও সম্পাদক, প্রকাশক কিংবা প্রকাশকাল নিয়ে কোনো উল্লেখ নেই। পত্রিকার নামের নিচে 'পূর্বাঞ্চলীয় যুদ্ধ বুলেটিন–১' লেখা ছিল আর ডান পাশের একটি ঘরে বঙ্গবন্ধুর বাণী লিখে রাখা হতো। পূর্বাঞ্চলীয় এই যুদ্ধ বুলেটিনটির ৪ কলাম বিশিষ্ট পত্রিকার দাম ধরা হয়েছিল ১০ পয়সা। এতে বেশিরভাগ জায়গাজুড়ে থাকত যুদ্ধ, যুদ্ধের সাফল্যের পাশাপাশি রাজাকারদের বিষয়ে বিভিন্ন লেখা।

(৫০) স্বদেশ

গোলাম সাবদার সিদ্দিকী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাপ্তাহিক *স্বদেশ* পত্রিকাটি বর্ণালী প্রেস, খুলনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। জুন মাসের ১৬ তারিখে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ পায়। চার পৃষ্ঠার পত্রিকাটির মূল্য ধরা হয়েছিল ২০ পয়সা। পত্রিকার শেষ পাতায় একদম নিচে প্রিন্টার্স লাইনের স্থান ইংরেজিতে লেখা ছিল The swadesh: Voice of National Bangladesh ।

(৫১) স্বাধীনতা (প্রতিরোধ)

স্বাধীনতা (প্রতিরোধ) পত্রিকাটি কোনো সম্পাদক ছাড়াই প্রকাশিত হতো। এর লেখালেখি ও অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অধ্যাপক বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, মুনতাসীর মামুন, কুতুবুর রহমান। ঢাকা থেকে সাইক্লোস্টাইলে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। প্রথমে পত্রিকাটির নাম স্বাধীনতা থাকলেও পরে তা পরিবর্তন করে *প্রতিরোধ* করা হয়। মোট ৬টি সংখ্যা প্রকাশ হয় এই পত্রিকার।

(৫২) স্বাধীনতা

আগরতলা থেকে সাংবাদিক অরুণাভ সরকারের সম্পূর্ন একক প্রচেষ্টায় জন্ম হয় *সাপ্তাহিক স্বাধীনতা* নামের পত্রিকাটির। ট্যাবলয়েড আকৃতির ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার সংবাদ সংগ্রহ, লেখালেখি, সম্পাদনা সব কাজই একা হাতে করতে হতো অরুণাভ সরকারকে। স্বাধীনতা যুদ্ধের খবরের পাশাপাশি পাকিস্তানিদের নির্যাতনের খবরে পরিপূর্ণ পত্রিকাটি কিছু বিক্রি হতো শরণার্থী শিবিরের আশ্রিত উদ্বাস্তুদের কাছে। কিছু হাত ঘুরে চলে যেত অবরুদ্ধ বাংলাদেশের ভেতরে। এমনকি আগরতলার স্থানীয় ভারতীয়রাও কিনত পত্রিকাটি, কাটতিও ছিল বেশ। কিছুটা অনিয়মিত হলেও ১৯৭১ এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত স্বাধীনতার প্রকাশনা অব্যাহত ছিল।

(৫৩) স্বাধীন বাংলা (১)

স্বাধীন বাংলা পত্রিকাটি ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটির চট্টগ্রাম বিভাগের পাক্ষিক মুখপত্র। ১০ পয়সা দামের পত্রিকাটিতে ৪ পৃষ্ঠা ও ৪ কলামে সংবাদ সন্নিবেশিত হতো। পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশকাল জানা না গেলেও ১৯৭১-এর ১ নভেম্বর এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের কথা জানা যায়। পত্রিকাটিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে উপস্থাপন করা হতো কমিউনিস্টদের দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে সেখানে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিই অগ্রগণ্য হতো পূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে।

(৫৪) স্বাধীন বাংলা (২)

বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল থেকে সরকার কবীর খান কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত *স্বাধীন বাংলা* মুক্তিবাহিনীর সাপ্তাহিক মুখপত্র ছিল। পত্রিকাটির প্রকাশ তারিখ অজ্ঞাত। ১০ পয়সার পত্রিকাটিতে ২টি কলাম ছিল। পত্রিকাটির শেষ পাতায় লেখা ছিল 'বাংলাদেশ মুক্তি সংস্থা (উত্তরপূর্ব এলাকা) কর্তৃক অনুমোদিত'। আবার পত্রিকার প্রথম পাতায় পত্রিকার নামের সাথে ডান দিকে ছোট হরফে ছাপা ছিল 'মেহনতী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম জয়যুক্ত হতে বাধ্য'।

(৫৫) স্বাধীন বাংলা (৩)

স্বাধীন বাংলা (সোনার দেশ) পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মিসেস জাহানারা কামরুজ্জামান। সম্পাদক এস এ আল মাহমুদ চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং বলাকা প্রেস জামালগঞ্জ, রাজশাহী, বাংলাদেশ থেকে এমএ মজিদ কর্তৃক মুদ্রিত। এর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচ কামরুজ্জামান। ১৯৭১-এর জুনে প্রথমবারের মতো যাত্রা শুরু করে পত্রিকাটি। পত্রিকার নামের নিচে ছোট ছোট হরফে বন্ধনীতে আবদ্ধ (সোনার দেশ) কথাটি লিপিবদ্ধ থাকত।

(৫৬) স্বাধীন বাংলা (৪)

বাংলাদেশি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাপ্তাহিক মুখপত্র হিসেবে মুজিবনগরের স্বাধীন বাংলা প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় *স্বাধীন বাংলা*। এ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন খোন্দকার সামসুল আলম দুদু। ১৫ পয়সা মূল্যের পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশের তারিখ নিশ্চিত না হওয়া গেলেও এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশ হয় ১৩৭৮ বঙ্গাব্দের ১৪ জ্যৈষ্ঠ। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি ২ পৃষ্ঠার হলেও পরবর্তী সংখ্যাগুলো কলেবরে বৃদ্ধি পেয়ে ৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।

(৫৭) স্বাধীন বাংলা (৫)

কাজী জাফর, মেনন প্রমুখ বামপন্থীর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে ১৯৭১-এর ২৫ অক্টোবর প্রথম প্রকাশ হয় *স্বাধীন বাংলা*। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে এই গ্রুপটি তখন

সোভিয়েত বিরোধী বামপন্থীদের নিয়ে পৃথক একটি কমিটি গড়ে তোলে। পত্রিকাটি গেরিলা যুদ্ধের সমর্থক ছিল। পত্রিকাটি নভেম্বর সংখ্যায় দিন দিন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ভারতীয় সরকার ও জনগণের নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে এবং গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতীয় সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের প্রতিহত করার আহ্বান জানায়।

(৫৮) স্বাধীন বাংলা (৬)

স্বাধীন বাংলা একটি দৈনিক পত্রিকা ছিল। নোয়াখালীর চৌমুহনী থেকে আমম আনোয়ারের সম্পাদনায় ২৬ মার্চ ১৯৭১ এ প্রথম প্রকাশিত হয় এই পত্রিকাটি। ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত এই স্থানীয় পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত ছিল।

(৫৯) সংগ্রামী বাংলা (১)

সংগ্রামী বাংলা পত্রিকাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। প্রধান সম্পাদক আবদুর রহমান সিদ্দিক এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সৈয়দ আব্দুল মতিন। পত্রিকাটিকে বাংলাদেশের মুখপত্র বলে দাবী করা হতো। পত্রিকাটি ঢাকার সংগ্রামী বাংলাদেশ প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো বলে জানা যায়। প্রকাশ ও মুদ্রণে ছিলেন আবদুর রহমান সিদ্দিক। ৩ কলাম ও ৪ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির বিক্রয়মূল্য ছিল ২০ পয়সা। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৮ অক্টোবর ১৯৭১।

(৬০) সংগ্রামী বাংলা (২)

অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম এমপির উপদেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজের ছাত্র এমদাদুল হক প্রধানের সম্পাদনায় মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে ১৯৭১-এর আগস্ট মাস থেকে যাত্রা শুরু করে *সংগ্রামী বাংলা* নামের এই দৈনিকটি। সংগ্রামী বাংলা প্রেস তেঁতুলিয়া থেকে এমদাদুল হক কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত এই পত্রিকার বিনিময় মূল্য ছিল ১০ পয়সা। ২ পৃষ্ঠা ও চার কলামের এই দৈনিকটি স্থানীয় মানুষকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল বলে জানা যায়।

(৬১) সাপ্তাহিক বাংলা

মাইকেল দত্তের সম্পাদনায় বাংলাদেশের মুজিবনগর ও সিলেট থেকে একযোগে প্রকাশিত হয় *সাপ্তাহিক বাংলা* নামের এ পত্রিকাটি। পত্রিকার নামের নিচে লেখা থাকতো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর। পত্রিকাটি রূপসী বাংলা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্সের পক্ষে বিজয় কুমার দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত হয়। পত্রিকার নামের দুপাশে বক্স করে উজ্জীবনীমূলক দেশপ্রেম ও ভালোবাসার কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া হতো। ১৯৭১ এর ১৬ সেপ্টেম্বর এ পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয়। ৮ পৃষ্ঠা ও ৬ কলামে চিত্রসংবলিত এই পত্রিকার বিনিময়মূল্য ছিল ৩৫ পয়সা। বিদেশে যোগাযোগের ঠিকানা হিসেবে আগরতলা, কলকাতা ও লন্ডনের ঠিকানা দেয়া ছিল পত্রিকাটিতে। এই পত্রিকাটির সাতটি সংখ্যার সন্ধান পাওয়া যায়।

(৬২) সোনার বাংলা (১)

সোনার বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন সরকার কবীর খান। প্রধান উপদেষ্টা মতিউর রহমান এবং কেজি মোস্তফা কর্তৃক সোনার বাংলা প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। ১২ জুন ১৯৭১ তারিখে পত্রিকাটির উদ্বোধনী সংখ্যা প্রকাশ পায়। এর স্থানীয় মূল্য ছিল ১৫ পয়সা ও ভারতে ২০ পয়সা। এটিকে মুক্তিবাহিনীর মুখপত্র হিসেবেও পরিচয় দেয় পত্রিকাটি।

(৬৩) সোনার বাংলা (২)

সোনার বাংলা বাংলাদেশের সাপ্তাহিক মুখপত্র। প্রথম প্রকাশ ১৪ আগস্ট ১৯৭১। দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় পরিবর্তন করে *বাংলার কথা* নামে। পরিবর্তিত পরিচালকবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত হয় পত্রিকাটির এই পরিবর্তিত সংস্করণ। এর সম্পাদক ছিলেন ওবায়দুর রহমান ও সহযোগী সম্পাদক ছিলেন মজিবর রহমান। ৩০ পয়সা মূল্যের পত্রিকাটিতে ৬ পৃষ্ঠায় ৪ কলামে সংবাদ উপস্থাপিত হতো।

(৬৪) সোনার বাংলা (৩)

সোনার বাংলা মূলত সাপ্তাহিক পত্রিকা হলেও শেষ দিকে প্রতিদিন এর সান্ধ্য সংস্করণ বের হতো। এতে প্রধান সম্পাদক ছিলেন এমএ শাহ (শাহ মোদাব্বির আলী) এবং ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন এ বি জালাল উদ্দিন। পত্রিকাটিতে তামাবিল, সিলেট প্রকাশনাস্থল হিসেবে মুদ্রিত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত এই বিপুল সংখ্যক সংবাদপত্রের নেপথ্যে কাজ করেছে এক একটি পৃথক রাজনৈতিক মতাদর্শ। খুব সাধারণ দৃষ্টিতে বললে গণমুক্তির পেছনে মওলানা ভাসানী, কিংবা জয়বাংলার পেছনে প্রকাশিতভাবেই উঠে আসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্পৃক্ততা। একই কথা প্রযোজ্য কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা সমমনা বামচিন্তার রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রেও। পত্রপত্রিকাগুলোর এই রাজনৈতিক বিভাজন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অরুনাভ সরকার বলেন,

> বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি থেকে পত্রিকা করে। যেমন 'জয় বাংলা' বেরিয়েছিল সম্পূর্ণ আওয়ামী লীগের টাকায়। এরকম অন্যান্য কোনো কোনো দলেরও, যেমন কমিউনিস্ট পার্টি। এরাও বিভিন্ন পত্রিকা করেছে। কোনো কোনো সময় দল হয়তো করেনি, কিন্তু কোনো দলের কোনো একজন নেতা হয়তো তার টাকাপয়সা দিয়ে একটা পত্রিকা করেছে। যদিও আমি কোনো দল করতাম না। আওয়ামী লীগও না, কমিউনিস্ট পার্টিও না, জামায়াতে ইসলামও না। পলিটিক্সের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত, সংবাদপত্রের একটা যোগাযোগ ছিল। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত কোনো যোগাযোগ ছিল না রাজনীতির সঙ্গে। যদিও রাজনীতি ছাড়া কোনোভাবেই দেশ চলতে পারে না, এ কথাও সত্য। [৩]

অরুনাভ সরকারের এ বক্তব্যে স্পষ্ট যে, কিছু কিছু প্রকাশনা যে সরাসরি রাজনৈতিক প্ররোচনা ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু রাজনৈতিক যে চেতনা বাংলাদেশের মানুষকে পাকিস্তানিদের কবলমুক্ত হতে আত্মিক প্রেরণা জোগান দিয়েছে সেই চেতনার ফলেই মুক্তির আলো দেখেছে সব পত্রপত্রিকা।

[৩] অরুণাভ সরকার, সাক্ষাৎকার।

একই ধরনের তথ্য পাওয়া যায় হারুন হাবিবের বক্তব্যেও। হারুন হাবিব প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বিষয়ে বলেন,

> আমার করা গবেষণায় আমি ৬০টিরও বেশি পত্রপত্রিকার সন্ধান পেয়েছি। কমিউনিস্ট যারা সেই সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। কারণ তখন তো একটা গণজাগরণের মুখে একটা ব্যাপার ছিল। তারা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্লেষণ করেছে। তখন অনেক কমিউনিস্ট ছিল যারা মুক্তিযুদ্ধকে মানেইনি দেশের মধ্যে, একটা পুরো পাকিস্তানের লড়াই বলত । কিন্তু আমি মনে করি, মেইনস্ট্রিম যারা, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশে এখন যারা আছে, এরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষেই শুধু নয়, এরা অংশগ্রহণও করেছে। তাদের নিজস্ব একটা গেরিলা বাহিনীও তারা তৈরি করেছিলেন বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু আওয়ামী লীগের মুখপাত্র হলেও, মুক্তিযুদ্ধের বা মুজিবনগর সরকারের মুখপত্র হয়ে উঠেছিলো *জয়বাংলা* পত্রিকা এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। সেটা কিন্তু আওয়ামী লীগের মুখপত্র হয়ে থাকেনি, মূলত মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে কমিউনিস্টদের পক্ষে বেরিয়েছিল সেটা আমি জানি। কিন্তু আমার যতটুকু না আমি দেখেছি, তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেই তারা নিশ্চয়ই লিখেছে, তার মধ্যেও তাদের দলীয় একটা দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে লক্ষ্য করা যায়।[৪]

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে মূলত রাজনীতি ছিল একটাই- সেটা হলো ২৬ মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনই ছিল রাজনীতির প্রধান গতিমুখ। রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেন,

> রাজনীতির বাইরে পুরো বিষয়টাকে ভাবার চেষ্টা করা হলেও সত্যি করে বললে মুক্তিযুদ্ধে যেহেতু রাজনীতিকরণ হয়েছে, কিংবা রাজনীতিরই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হলো মুক্তিযুদ্ধ। তখনকার রাজনীতিটা কী ছিল? পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হলো, আওয়ামী লীগ ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। সব সিটই পেল। তখন ভাসানী ন্যাপ বয়কট করল '৭০-এর নির্বাচন। কমিউনিস্ট পার্টি তো তখন গঠনই হয়নি। আর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও আওয়ামী লীগের সঙ্গেই ছিল। কাজেই আওয়ামী লীগই

[৪] হারুন হাবীব, সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

> তখন মুখ্য রাজনৈতিক শক্তি। কাজেই বিভাজন এতটা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়নি। বিভাজন এখন দেখছি, তখন দেখিনি। যদিও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, তারপরও বলতে হবে, সব দল-মতের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছে। তখন রাজনৈতিক বিভাজন আজকের মতো এতটা প্রকট ছিল না। তখন পাকিস্তান বিরোধী একটা মনোভাব সবার মধ্যেই কমবেশি ছিল। আর আওয়ামী লীগ মুখ্য দল হিসেবে তার নেতৃত্ব দিয়েছে শুধু।[৫]

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর রাজনৈতিক চিন্তা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে ভিন্নতা ছিল এমন তথ্য পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত সংবাদ ও মতামতে পাওয়া যায়। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে এক বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য সবার মধ্যেই কাজ করেছে। এ বিষয়ে মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত অগ্রদূত পত্রিকার সম্পাদক আজিজুল হক বলেন,

> আমার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। আমি আগেও দল করেছি। এখনও করি। আমি এখনও রৌমারীতে আওয়ামী লীগের থানা সভাপতি। কিন্তু যখন আমি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলি, তখন দলের আদর্শ থেকে বের হয়ে আসি। যেহেতু ইতিহাস, সেহেতু পক্ষপাতিত্বের জায়গাটা থেকে বের হতে হয়। এসব পার্থক্য ছিল একান্ত ভেতরের বিষয়। নেতৃত্বের বড় পর্যায়ের বিষয় ছিল ওই পার্থক্যগুলো। এমনকি শরণার্থী শিবিরেও এই পার্থক্যের ছাপটা ছিল। চীনপন্থীরা চীনপন্থীদের সাথে থাকবে, ন্যাপের লোক ন্যাপের লোকের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু সবার ঐকমত্য স্বাধীনতার বিষয়ে ছিল। তাই চলার পথটা ভিন্ন হলেও মূল চাওয়াটা এক থাকায় ওখানটায় কোনো সুস্পষ্ট ফারাক ছিল না।[৬]

সহজ ভাষায় বললে জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে সে সময় শুধু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগই নয় ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কিংবা বেশ কিছু কমিউনিস্ট ঘরানার দলও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সময় যোগ দেয় সম্মুখ যুদ্ধ কিংবা গেরিলা যুদ্ধে। এসব সম্পৃক্ততার মুখপত্র হিসেবে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন সময় এক একটি পত্রপত্রিকার উদ্ভব ঘটেছে। এসব পত্রপত্রিকা আদর্শগত বিচারে তার নিজস্ব ঘরানার প্রতি একনিষ্ঠ হলেও জাতীয় স্বার্থকে পাশ কাটিয়ে কোনোও বিতর্ক তৈরি করার কোনো অভিপ্রায় কারও মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়নি।

[৫] হারুন হাবীব, সাক্ষাৎকার।

[৬] আজিজুল হক, সাক্ষাৎকার, ঢাকা, তারিখ: মে ১২, ২০১৪। পৃ: । আজিজুল হক, মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত অগ্রদূত পত্রিকার সম্পাদক।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের পুরো বিষয়টি সবার কাছে এত বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল যে একে তুচ্ছ করে অন্য কোনো স্বার্থ হাসিলের ভাবনা তখন কাউকে প্রভাবিত করেছে বা করার উপক্রম করেছে বলে জানা যায় না। যেসব সংবাদপত্র মুক্তাঞ্চল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিকদের হাত দিয়ে প্রকাশ হতো সেগুলোতে আদর্শগতভাবে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার প্রভাব দাবি করা হলেও বেশিরভাগে এমন সংশ্লিষ্টতা মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ পরিবেশনে সংবাদপত্রগুলোর যে মূল লক্ষ্য সেটি থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলে ধরা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকেপ্রকাশিত পত্রপত্রিকায়

রণাঙ্গনের খবর

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর একটা খণ্ডচিত্র পূর্ববর্তী অধ্যায়ের মাধ্যমে তুলে আনা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সেসব প্রকাশনায় কারিগরি দক্ষতার অভাব ছিল এবং সংবাদমাধ্যমগুলোতে কর্মরত জনবলে যথেষ্ট গুণগত মানসম্পন্ন সংবাদকর্মী নিযুক্ত ছিল বলেও জানা যায় না। পেশাগত সাংবাদিকরা পরবর্তীকালে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান কিংবা শরণার্থী শিবিরগুলোর চিত্র তাদের লেখনীতে তুলে আনার প্রবণতা তৈরি করলেও সেই সংখ্যাটা একটা বড় সময় পর্যন্ত ছিল একেবারেই নগণ্য। তবে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত ওইসব সংবাদপত্রের প্রকাশনা শুরু থেকেই যে প্রভাব তৈরি করেছিল তার উদ্দেশ্য সাধনে, তা ছিল অনস্বীকার্য। পরবর্তী সময়ে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের আগ পর্যন্ত যুদ্ধ প্রকৃতি গেরিলা ধাঁচের হওয়ায় পত্রপত্রিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের আগাম গতিপ্রকৃতি লিপিবদ্ধ হয়নি ঠিকই। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের যুদ্ধের চালচিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল উদ্বুদ্ধকরণে এসব সংবাদপত্র যেমন সফল ছিল, তেমনি রণাঙ্গনে ও সাধারণ মানুষ এবং নারীদের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের মদদপুষ্ট রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞের চিত্র তুলে ধরে মুক্তিযোদ্ধাদের করণীয় নির্ধারণে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল এই সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত খবর।

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত এসব সংবাদপত্রে নিযুক্ত সংবাদদাতা কিংবা সংবাদ সংগ্রাহকদের সম্যক পরিস্থিতি বিষয়ে প্রবাসী বাংলাদেশে সরকারের একমাত্র মুখপত্র *জয়বাংলা* পত্রিকার রণাঙ্গনের নিজস্ব প্রতিবেদক ও মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবিব বলেন,

> দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যারা ওসব পত্রপত্রিকায় কাজ করেছে, তাদের মধ্যে পেশাদার সাংবাদিকের সংখ্যাটা ছিল খুবই কম। সাজেদ চৌধুরী, তখন দৈনিক পাকিস্তানের সাব এডিটর ছিলেন। যুদ্ধে গিয়ে সিলেটের ধল্লা এলাকায় সাব-সেক্টর কমান্ডার হিসেবে সরাসরি যুদ্ধ করেছেন তিনি। তবে এরকম পেশাদার সাংবাদিকের সংখ্যাটা খুব কম ছিল। পরবর্তী সময়ে অনেকে সাংবাদিক হয়েছে। কিংবা সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে। রিফিউজি ক্যাম্পের লেখালেখিতেও কাজ করেছে অনেকে।

> তবে রণাঙ্গন থেকে সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে পেশাজীবী সাংবাদিকদের সম্পৃক্ততাটা ছিল খুবই অপ্রতুল। [১]

মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত *অগ্রদূত* পত্রিকার সম্পাদক আজিজুল হক সংবাদ সংগ্রহ বিষয়ে বলেন,

> স্থানীয়ভাবে কয়েকজন আছেন যাদেরকে সবাই চেনে। কিন্তু ওদের নাম আসলে ওভাবে আর মনে করতে পারছি না। লেখকরা সংখ্যায় সীমিত। সবার লেখাই মোটামুটি চিনতাম। কারও না কারও মারফত হাতে করে পাঠিয়ে দিত। আমি পেয়ে যেতাম। যে নিয়ে আসত, সে মুক্তিযুদ্ধের জিনিস হিসেবে খুব যত্ন করে তা নিয়ে আসত। এমনকি সেই সব বার্তাবাহক খুব সাধারণ মানুষের অবদানও অস্বীকার করার মতো নয়। [২]

এ বিষয়ে মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত আরেকটি সংবাদপত্র *সাপ্তাহিক স্বাধীনতা*র সম্পাদক অরুণাভ সরকারের কথাতেও পাওয়া যায় একই ধরনের অভিমত। তিনি বলেন,

> সাধারণত পেশাদার সাংবাদিকদের সহায়তা এসব সংবাদপত্রে ছিল না। যুদ্ধের খবর, যুদ্ধে যারা গেছেন, তাদের সঙ্গে আমরা সরাসরি যোগাযোগ করে, তাদের মুখ থেকে জেনে নিতাম। অনেক সময় তারাও এসে আমাদের জানাতেন। এদেশে পাকিস্তানিরা মানুষের ওপর কি ধরনের অত্যাচার করছে সে কাহিনীগুলো শরণার্থীদের কাছ থেকেই জানা যেতো। ওইসব তথ্যই সংকলিত আকারে প্রকাশ করা হত সংবাদপত্রগুলোতে।[৩]

[১] হারুন হাবীব, সাক্ষাৎকার ।

[২] আজিজুল হক, সাক্ষাৎকার ।

[৩] অরুণাভ সরকার, সাক্ষাৎকার ।

তবে এসব কাজে পেশাদার সাংবাদিকদের অনুপস্থিতি তথ্যের সত্যতা কিংবা বস্তুনিষ্ঠতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবেও দেখেছেন অনেকে। অরুণাভ সরকার এ বিষয়ে বলেন,

> সে রকম সুযোগ ছিল না। যে ঘটনা ঘটে গেছে, পরে গিয়ে যাচাই করারও অবকাশ ছিল না মোটেও। এসব ক্ষেত্রে যাদের ওপরে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল, তাদের প্রতিবেদনই গ্রহণ করতাম। বাকিদেরটা বাদ পড়তো গ্রহণযোগ্যতার অভাবে। আর আমার পত্রিকায় তো আমি একাই সবকিছু লিখতাম। সম্পাদনাও করতাম। যতদূর মনে পড়ে আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী সম্ভবত একবার একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ রকম হঠাৎ দু'একটা প্রবন্ধ কারও কারও প্রকাশ হয়েছে। তাছাড়া খবর যা ছিল সবকিছু আমি একাই করেছি। [৪]

রণাঙ্গনের খবর প্রকাশ সম্পর্কে রৌমারী মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত *অগ্রদূত* পত্রিকার সম্পাদক আজিজুল হক বলেন, 'আমার পত্রিকায় একটা কলাম ছিল। অন্যান্য খবর তো থাকতোই। রণাঙ্গনের সংবাদগুলোর মধ্যেই সার্বিক পরিস্থিতিটা উঠে আসতো। কোথায় মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালালো, কিংবা রাজাকার মারা হলো, সবকিছুই উঠে আসতো।' [৫]

তবে রণাঙ্গনের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একাধিক তথ্যের উপর নির্ভরশীলতার কথাও জানা যায়। এ সম্পর্কে ২০০১ সালে আবু নাসের রাজীব কর্তৃক পরিচালিত ও সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন ও দ্য ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে প্রকাশিত গবেষণা প্রকাশনা *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বিবিসির* দেয়া তথ্যমতে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত এসব সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকেই শতকরা ১১.৫০ ভাগ যুদ্ধের খবরাখবর পাওয়া যেতো।[৬] যেখানে ভারতীয় বার্তা সংস্থার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধা ও অন্য সংবাদদাতারাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন সংবাদের মূল উৎস হিসেবে।

[৪] অরুণাভ সরকার, সাক্ষাৎকার।

[৫] আজিজুল হক, সাক্ষাৎকার।

[৬] আবু নাসের রাজীব (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বিবিসি*, (ঢাকা: বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন ও দ্য ব্রিটিশ কাউন্সিল, এপ্রিল ২০০১), পৃষ্ঠা - ১০৬

অন্যদিকে ১৯৯২ সালে অনুপম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত খালিদা আকতারের গবেষণাগ্রন্থ *পত্র-পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধতে* দেয়া তথ্যমতে, তৎকালীন অবরুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানের প্রথাগত সংবাদপত্র কিংবা সংবাদমাধ্যমগুলো থেকে প্রেরিত সংবাদ শাসকগোষ্ঠীর কড়া নজরদারির ও সেন্সরশিপের জন্য বহুলাংশেই ছিল বিশ্বাসযোগ্যতার অতীত।[৭] সেসব ক্ষেত্রে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রণাঙ্গন থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি প্রেরিত বার্তা কিংবা সরেজমিন ঘুরে তথ্য সংগ্রহই ছিল অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত এই অঞ্চলে সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ অনেক ক্ষেত্রে সহজসাধ্য না হওয়ায় রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যই ছিল অবলম্বন।

এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুক্ত প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত মুহাম্মদ নুরুল কাদির রচিত *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা* শীর্ষক গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী, কলকাতা থেকে *জয়বাংলা* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ উল্লাহ চৌধুরী নিয়মিতভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের খবর পাঠাতেন।[৮] সেসব তথ্যই পরবর্তী সময় মুহাম্মদ নুরুল কাদির প্রেসক্লাবের মারফত কিংবা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন দিল্লির সাংবাদিকদের। বুৎপত্তিগত বিচারে সেসব তথ্যের মূলোৎপাটন করলেও পাওয়া যায় ওই সরাসরি রণাঙ্গন থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের পাঠানো তথ্যেরই প্রতিফলন।

তবে সার্বিক দৃষ্টিতে রণাঙ্গন থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও সংবাদপত্রগুলোর প্রকাশিত সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতা বরাবরই ছিল প্রশ্নাতীত। যথার্থভাবেই প্রশ্ন থেকে যায় ওইসব প্রকাশিত সংবাদে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিকে কতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কিংবা সংবাদের নামে তথ্যের অতিরঞ্জনের কোনো অবকাশ তখন ছিল কি না। অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র যেখানে পাকিস্তান সরকারের সেন্সরশিপের রোষানলে, সেক্ষেত্রে উল্টোদিকে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ওপর প্রাথমিকভাবে কোনো ধরনের নির্দেশনা ছিল অনুপস্থিত। সেক্ষেত্রে প্রকাশিত সংবাদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার

[৭] খালিদা আকতার, *পত্রপত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ*, ফরিদ কবির (সম্পাদিত), *হৃদয়ে আমার বাংলাদেশ*, (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২), পৃষ্ঠা - ২৬

[৮] মুহাম্মদ নুরুল কাদির, দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, (ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, মার্চ ১৯৯৭), পৃষ্ঠা - ২১২

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়টি ছিল দর্শণীয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সংবাদপত্রের মূল লক্ষ্যই যখন গুটিকয়েক ব্যতিক্রমী জনগোষ্ঠী ব্যতীত মূল জনস্রোতের পক্ষে অবস্থান নেয়া, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদপত্রগুলোর অবস্থান অনেকটাই যৌক্তিক বিবেচিত হতো। এ প্রসঙ্গে অরুণাভ সরকার বলেন,

> ওই সময় মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে ছোট করে দেখিয়ে বা কম গুরুত্ব দিয়ে লিখে কারও পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের বিশালতা এতটাই বড় ছিল যে ওটাকে অতিরঞ্জিত করাটাও ছিল অসম্ভব। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে এ ভূখণ্ডের বেশিরভাগ মানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধ নিজেই অনেক উঁচু, অনেক বড়।[৯]

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোতে রণাঙ্গনের যেসব খবর প্রকাশ করা হতো তার অংশবিশেষ নিচে তুলে ধরা হলো। যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সফলতার চিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের অপূর্ব্ব সাফল্য

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত ১৯ শে মে, নওগাঁর উত্তরে, ধামুইররে একদল পাকসেনার সহিত মুক্তি যোদ্ধাদের তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হয়। উভয়পক্ষে সময় ধরিয়ে গোলাগুলি বিনিময় হয়। এই যুদ্ধে একজন ক্যাপটেনসহ ৪০ হইতে ৫০ জন সৈন্য নিহত হয়। মুক্তি যোদ্ধাদের একজন নিহত ও ২ জন আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সংগ্রামে পাকসেনার কয়েকটি গাড়ি ভস্মীভূত হয়।

বঙ্গ বাণী ॥ ১: ১ ॥ ২৩ মে ১৯৭১

গেরিলা তৎপরতা

তেজগাঁ বিমান ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্ত

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

ঢাকার মুক্তাঞ্চল ১৫ই জুন, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা গতকাল ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করে। কড়া পাহারা মোতায়েন সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা পদ্ধতিতে সেখানে হাত বোমা বর্ষণ করে নিরাপদে ফিরে আসে। বোমাবর্ষণের ফলে বিমান বন্দরটির টার্মিনাল ভবন ও রানওয়েটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দৈনিক বাংলাদেশ ॥ ১: ৭ ॥ ১৮ জুন ১৯৭১

[৯] অরুণাভ সরকার, সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচণ্ড আক্রমণে খান সেনা দিশেহারা

মহিলারাও পিছিয়ে নেই

বিশেষ খবরে প্রকাশ উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনের কোনও এক স্থানে খানসেনারা নিজেদের মনে কুপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য যখন কতিপয় মহিলার উপর আক্রমণ চালায় তখন সেই সমস্ত মহিলার প্রতিরোধে তিনজন খান সেনা প্রাণ হারিয়েছে। এবং কয়েকজন পালিয়ে গিয়ে নিজেদের জীবন রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে।

স্বাধীন বাংলা (২) ॥ ১৯৭১

সাতক্ষীরায় মুক্তিফৌজের তৎপরতা

সাতক্ষীরায় মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ৬০০ শত্রুসেনা নিহত হয়েছে। এছাড়া ২৬টি আক্রমণে তারা ৩০০ জন পাক সৈন্যকে খতম করেন। ভোমরা, পারুলিয়া, মামুদপুর, কুশখালি ও কাকডাঙ্গায় আক্রমণ চালানো হয়। এছাড়া সাতক্ষীরার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলীম লীগ ও জামাতে ইসলামের গুণ্ডা ও হানাদার সৈন্যদের পদলেহী দালালদের খতম করার কাজ ব্যাপকহারে শুরু হয়েছে। এরমধ্যে মুক্তিফৌজ পাটকেলঘাটা, তালা, পাইকগাছা, আশাশুনি, বদরতলা, কলারোয়া প্রভৃতি স্থানে ১৬জন দালালকে গুলি করে হত্যা করেছেন।

স্বদেশ ॥ ১: ৩ ॥ ১৪ জুলাই ১৯৭১

বাঙলাদেশে এ পর্যন্ত কুড়ি হাজারেরও বেশি পাকসৈন্য খতম

-কর্ণেল ওসমানি

বাংলাদেশের কোন এক স্থানে ২রা আগস্ট (পিটিআই) খুব কম করে ধরলেও জানা গিয়েছে যে, ২৫ শে মার্চ বাংলাদেশে পাক সেনাদের অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানী বাহিনীর ২০ হাজারেরও অধিক অফিসার ও সৈন্য বাংলাদেশে মুক্তিসেনাদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। প্রধান সেনাবাহিনী বলেন যে, শত্রুপক্ষের অফিসার ও সৈন্য এতো দ্রুত ও অধিকহারে খতম হওয়ায় পাকিস্তানী সেনারা বিচলিত ও হতাশ হয়ে পড়েছে।

বিপ্লবী বাংলাদেশ ॥ ১: ১ ॥ ৪ আগস্ট ১৯৭১

রণাঙ্গন সংবাদ

[হারুণ হাবিব প্রদত্ত]

বাংলার বীর স্বাধীনতা যোদ্ধাদের বুলেটের আঘাতে ইয়াহিয়ার ভাড়াটে দস্যুদল তাদের পৈতৃক জান নিয়ে এখন পালাতে ব্যস্ত। গত ১০ই সেপ্টেম্বর মোমেনশাহী রণাঙ্গনের কামালপুরের সন্নিকটে মুক্তিফৌজের দখলিকৃত এলাকায় ১৫০ জনের একটি দস্যুদল আক্রমণ চালাতে এলে আমাদের বীর স্বাধীনতা যোদ্ধাদের বুলেটের আঘাতে ৬৬ জনেরও বেশি নিহত হয়। মুক্তিফৌজ পাকবাহিনীর বহু অস্ত্র সম্ভারও হস্তগত করে এবং নিহত এক পাকসেনাকে পরিপূর্ণ সম্মানে কবর দেয়। মুক্তিফৌজের অন্য একটি দল নকসি পাক ছাউনীতে আক্রমণ পরিচালনা করে ১৮ জন পাক সেনাকে হত্যা করেন। এছাড়াও কলমাকান্দা, দেওয়ানগঞ্জ, বাহাদুরাবাদ ও মদনে সফলতার সঙ্গে আক্রমণ পরিচালনা করে আরও ৩৩ জন পাক সেনা ও দালাল বাহিনীকে হত্যা করেন।

অগ্রদূত ॥ ১: ৩ ॥ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিবাহিনীর সম্প্রসারণে বাংলাদেশ সরকার

মুজিবনগর ১১ অক্টোবর: খবরে প্রকাশ বাংলাদেশ সরকার মুক্তিবাহিনীর সম্প্রসারণে এক বিরাট কর্মসূচি গ্রহণ করিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রিক্রুটমেন্ট চলিতেছে। সর্বোপরি, মুক্তিবাহিনীকে সর্বাধুনিক অস্ত্রের সহিত পরিচিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বাংলাদেশ (১) ॥ ১: ১৬ ॥ ১১ অক্টোবর ১৯৭১

মুক্তিবাহিনী এবার বিমান হামলা চালাবে

বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলের কোন এক জায়গায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন যে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য মুক্তিবাহিনী ইতিমধ্যে বেশকিছু বিমান বহরও সংগ্রহ করেছেন। জনাব ইসলাম আরও বলেন যে মুক্তিযোদ্ধারা মুক্ত এলাকায় এখন বেশকিছু বিমান অবতরণ ক্ষেত্র এবং হেলিকপ্টারও পেয়েছেন। গেরিলাদের জন্য রসদ সরবরাহ এবং শত্রুর অবস্থান নির্ণয়ের কাজেই এগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব বিমান সংগ্রহের সূত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলেন যে, প্রবাসী বাঙালীদের অর্থেই এগুলো সংগৃহীত হয়েছে। নিঃস্বার্থ সেবার জন্যে জনাব ইসলাম তাদেরকে অভিনন্দন জানান।

দাবানল ॥ ১: ৪ ॥ ৩১ অক্টোবর ১৯৭১

বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর সাফল্য

বাংলাদেশ নেভাল ফোর্স ৯ নং সেক্টরে বেশ সাফল্যের সাথে মঙ্গলা ও চালনায় পাক সেনাদের কয়েকটি জাহাজ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। নৌবাহিনীর ডুবুরীরা এ সকল আক্রমণ চালায়। এছাড়া নৌবাহিনী কয়েকটি নদীবন্দরে পাক সেনাদের বেশ কয়েকখানা লঞ্চ ও স্টিমার ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। আমাদের রণাঙ্গন প্রতিনিধি সম্প্রতি একটি নৌ-যান পরিদর্শনে গেলে নেভাল লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ খুরশিদ (তথাকথিত আগরতলা মামলার আসামী) এর সাথে এক সাক্ষাতকার ঘটে। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান যে, এই নৌ-বাহিনী পাক সেনাদের যেকোন শক্তির সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম। তিনি আরও বলেন যে, এই সেক্টরের নেভাল বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার পিছনে সকল অফিসার ও কমাণ্ডারদের দান অপরিসীম।

বিপ্লবী বাংলাদেশ ॥ ১: ১২ ॥ ৭ নভেম্বর ১৯৭১

রণাঙ্গনে সকল ফ্রন্টে মুক্তিবাহিনীর দুর্বার অগ্রগতি

বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলের কোন এক জায়গায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন যে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য মুক্তি বাহিনী ইতিমধ্যে বেশকিছু বিমান বহরও সংগ্রহ করেছেন। জনাব ইসলাম আরও বলেন যে মুক্তিযোদ্ধারা মুক্ত এলাকায় এখন বেশকিছু বিমান অবতরণ ক্ষেত্র এবং হেলিকপ্টারও পেয়েছেন। গেরিলাদের জন্য রসদ সরবরাহ এবং শত্রুর অবস্থান নির্ণয়ের কাজেই এগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব বিমান সংগ্রহের সূত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি বলেন যে, প্রবাসী বাঙালীদের অর্থেই এগুলো সংগৃহীত হয়েছে। নিঃস্বার্থ সেবার জন্যে জনাব ইসলাম তাদেরকে অভিনন্দন জানান।

দাবানল ॥ ১: ৪ ॥ ৩১ অক্টোবর ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ঘাঁটি হইতে পাক বাহিনীর পশ্চাদপসরণ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

আমাদের দুর্ধর্ষ মুক্তিবাহিনী ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে শত্রুসেনার উপর চূড়ান্ত আঘাত হেনে চলেছে। মুক্তিবাহিনী আর মিত্রবাহিনীর সম্মিলিত চরম আঘাতে নাজেহাল হয়ে পাক বাহিনী একের পর এক তাদের ঘাঁটিগুলি ছেড়ে দিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। শত্রুসেনারা এখন কয়েকটি ক্যান্টনমেন্টে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী তাদেরকে সর্বদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তাদের পালাবার আর কোনও পথ নেই। যশোর রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনী মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় দুর্ভেদ্য যশোর ক্যান্ট দখল করে নিয়েছে। যশোর বিমানবন্দর সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করে আর এক তুমুল সংঘর্ষের পর ঝিনাইদহ শহরটি মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী দখল করে নেয়। যশোর এখন সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত। রংপুরের লালমনিরহাট বিমানবন্দর আমাদের মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর দখলে এসেছে। দিনাজপুর শহর দখল করার জন্য মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী শত্রুছাউনীর উপর প্রবল আক্রমণ চালিয়েছে। সেখানে এখন তুমুল যুদ্ধ চলছে। কুমিল্লা রণাঙ্গনে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মিত্রবাহিনীর সহযোগিতায় কুমিল্লা বিমানবন্দর ও কুমিল্লা শহর দখল করে নিয়েছে। ময়নামতি ক্যান্ট এখন সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী পাক সেনাদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। মোমেনশাহী, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর ও জামালপুর শত্রুকবল থেকে মুক্ত করে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর বীর সেনারা মোমেনশাহী শহর ও ক্যান্টনমেন্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লাকসাম ও আখাউড়া আমাদের বীরসেনা ও মিত্রবাহিনীর পূর্ণ দখলে। আখাউড়া ও কুমিল্লার সংঘর্ষে সাত শতাধিক খানসেনা নিহত হয়েছে। ছাতক ও শ্রীহট্ট শহর সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত হয়েছে। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ মহকুমা শত্রুকবল থেকে মুক্ত। চারিদিক থেকে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী ঢাকার দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। নারায়ণগঞ্জ থেকে মাত্র ১২ মাইল দূরে মেঘনার তীরে দাউদকান্দি পর্যন্ত আমাদের বীর সেনারা ও মিত্রবাহিনী এসে পৌঁছেছে। তাদের সুবিশাল দৃষ্টি ঢাকার দিকে।

বাংলাদেশ (৪) ॥ ১: ৭ ॥ ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

রাহুমুক্ত বাঙলাদেশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাঙলাদেশ আজ রাহুমুক্ত। গত বৃহস্পতিবার বাঙলাদেশ সময় বিকাল ৫.০১ মিঃ-এ ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পাক দখলদার বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেঃ নিয়াজীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে বাঙলাদেশের উপর ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকচক্রের কর্তৃত্ব ও জবর-দখলের অবসার ঘটে। অবসান ঘটে গত নয় মাসের বিভীষিকার রাজত্বের। মৃত্যু ঘটে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি তত্ত্বের এবং পূর্বাঞ্চলে বিলুপ্ত হয় ঐ কুখ্যাত তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র পাকিস্তান– যে পাকিস্তান ছিল জাতিসমূহের কারাগার।

.

.

.

বাঙলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কবির আহমদ, ন্যাপ নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি নূরুল ইসলাম প্রমুখ ইতিপূর্বেই মুজিব নগর হইতে ঢাকা রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

মুক্তিযুদ্ধ ॥ ১: ২৪ ॥ ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রণাঙ্গনের সংবাদ থেকে সংগৃহীত এই সকল উপাত্তের মাধ্যমে কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, সংবাদপত্রগুলোতে সংবাদ প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের প্রদেয় তথ্যে সিংহভাগ ক্ষেত্রেই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রচ্ছন্ন আধিক্যের বিষয়টি চোখে পড়ার মতো। সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের মৌলিক গুণাবলির মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিনিরপেক্ষতা আপাতদৃষ্টিতে ওই সংবাদগুলোতে অনুপস্থিত থাকলেও তা সমকালীন বাস্তবতায় অবরুদ্ধ বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের প্রাণের দাবিকেই তুলে ধরেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। যেখানে সংবাদের বৈশ্বিক সংজ্ঞার ব্যত্যয় ঘটলেও তা সেই সময়ের জন্য কতটুকু যৌক্তিক ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দ্বিতীয়ত, প্রকাশিত সংবাদের ভাষারীতি ও ভাষাগত বাহুল্য অনেক ক্ষেত্রেই সাংবাদিকতার মৌলিক দাবিকে উপেক্ষা করে। প্রকারান্তরে তা সংবাদ পরিবেশনের দুর্বলতা হিসেবে পরিগণিত করা গেলেও ওইসব সংবাদ পরিবেশনের যে মূল উদ্দেশ্য, রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করা, তাতে যে ষোলো আনা সফলতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শুধু প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অকথিত মুখপত্র হিসেবেই নয়, বরং রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল যাতে অটুট থাকে, সেই উদ্দেশ্য সাধনেই সম্ভবত, অবরুদ্ধ বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বাহিনী ও তার দোসরদের বর্বরোচিত হামলার মাধ্যমে কিঞ্চিত আঞ্চলিক সফলতার মতো সূক্ষ্ম বিষয়গুলো সংবাদের বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পায়নি। বিষয়টি সংবাদ চর্চার দৃষ্টিকোণ থেকে বেমানান হলেও স্বীয়স্বার্থ রক্ষায় যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছে।

তবে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো বহুমতের সংবাদপত্রের মধ্যেও ঐক্যতানের বিষয়টি। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র স্বীকৃত মুখপত্র 'জয়বাংলা' পত্রিকা আর 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' ছাড়াও মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত অগণিত পত্রপত্রিকার সন্ধান মেলে যার বেশিরভাগেরই সম্পৃক্ততা দৃশ্যমান ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে। কিন্তু এই মতনৈক্যের পরও এক ও অভিন্ন দাবির প্রেক্ষাপটে সকল প্রকাশনায় যে অভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে তা লক্ষণীয়। বৃহৎ দাবির কাছে মতাদর্শের উপেক্ষণীয় পার্থক্যকে

পত্রিকাগুলো দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিল। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় তাদের সংবাদগুলোর অভিন্ন ও সমচিন্তার প্রকাশভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে।

পাশাপাশি এ কথাও সত্য অবরুদ্ধ বাংলাদেশের তৎকালীন জাতীয়ভাবে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং ওইসব প্রকাশনার তথ্যের ওপর সেন্সরশিপের জন্য তা প্রবলভাবে জনসংযোগ হারিয়েছিল। সেই শূন্যস্থান পূরণের অভিপ্রায় নিয়ে আঞ্চলিকভাবে প্রকাশিত এসব মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর রণাঙ্গনের সংবাদ একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল বলা চলে।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায়

অবরুদ্ধ বাংলাদেশ : নির্যাতন ও গণহত্যার বিবরণ

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রগুলো পরিপূর্ণ মাত্রায় পাকিস্তানি প্রশাসনিক চাপ ও সেন্সরশিপের কারণে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে ছিল অতিমাত্রায় অপারগ। যে কারণে সেই সময় প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রকাশিত সংবাদে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের চিত্র ছিল নিতান্তই অনুপস্থিত। উল্টোদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড ও স্বাধীনতাকামী যেকোনো তৎপরতার বিরূপ চিত্র উপস্থাপনের একটি লক্ষণ দেখা যেত প্রতিষ্ঠিত সেসব পত্রপত্রিকার প্রকাশনাগুলোতে। যে কারণে মূলত ব্যক্তি ও দলগতভাবে মুক্তাঞ্চল এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে বিক্ষিপ্তভাবে নানা সময় বিভিন্ন সংবাদপত্রের উদ্ভব। অবরুদ্ধ বাংলাদেশের একটি সম্যক চিত্র উপস্থাপনই যখন মূল লক্ষ্য তখন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই সেসব পত্রপত্রিকাগুলোর উপস্থাপনায় যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তার সহযোগী অঙ্গসংগঠনগুলো দ্বারা পরিচালিত নির্যাতন ও নিপীড়নের পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত গণহত্যার সুস্পষ্ট বিবরণ। কৌশলগত কারণে ও গেরিলা যুদ্ধের রণকৌশলের বিচারে প্রায় সবক্ষেত্রেই মুক্তিযোদ্ধাদের আগাম অভিযানের বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হতো প্রকাশিত সংবাদগুলোতে। কিন্তু অভিযান পরবর্তী সাফল্য নিয়ে নিয়মিত পরিসরে সংবাদ, কলাম কিংবা সম্পাদকীয় আকারে প্রকাশ হতো।

২৫ মার্চের কালোরাতের পর থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিজয়ের পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশ যে একটি তীব্র যুদ্ধ অতিক্রম করেছে সেটা অনেকাংশেই অভিজ্ঞতানির্ভর। সেই সময়টি যারা প্রত্যক্ষ করেননি তাদের পক্ষে বিষয়টি অনেকাংশে ধারণা করা দুষ্কর। একদিকে সম্পূর্ণভাবে প্রথাগত রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা এই ভূখণ্ডে স্বাধীনতাকামী ও স্বাধীনতাবিরোধী দুটি সুস্পষ্ট ধারার মানুষের উপস্থিতি। স্বাধীনতাবিরোধীরা সংখ্যায় স্বাধীনতাকামীদের চেয়ে নিতান্ত অপ্রতুল হলেও রাষ্ট্রীয় ও সেনা নিয়ন্ত্রিত এই ভূখণ্ডে সংখ্যার দিক থেকে পিছিয়ে পড়ারাই এগিয়ে ছিল নিজ মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে। অবকাঠামোগতভাবে ভেঙে পড়া একটা ভূখণ্ডের মানুষ কতটা নিরাপত্তাহীনতায় দিনাতিপাত করতে পারে, সেটা সেই সময়ের বাঙালি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের অবর্ণনীয় দিনগুলোর কথা বিচারে না আনলে হয়তো বা বোঝাও যাবে না। সেই

অবরুদ্ধ কিংবা প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ একটি দেশের কথা, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণেই তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমগুলোতে ছিল পুরোমাত্রায় অনুপস্থিত। বরং সেখানে খুব স্বাভাবিক একটি দেশের চিত্র তুলে ধরার অপচেষ্টাই করা হয়েছে সম্ভাব্য প্রতিটি ক্ষেত্রে। উল্টোদিকে দেশের সচেতন মানুষের জানার আগ্রহ কিংবা বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর কাছে বাংলাদেশের সম্যক পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে বিশ্বের দুয়ারে জনমত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদশে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এ সংবাদপত্রগুলোই ছিল একমাত্র সম্বল।

সেই সময়ের ভয়াবহতা পরবর্তী বিভিন্ন সময় মুক্তিযোদ্ধা, প্রাবন্ধিক থেকে শুরু করে কথাসাহিত্যিকদের দিনপঞ্জিকায় উঠে এসেছে। ১৯৯৯ সালের ২৫ নভেম্বর দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত সুফিয়া কামালের *একাত্তরের ডায়েরী থেকে* শিরোনামের কলাম ছাপা হয়। সেখানে তিনি লিখেছেন,

> মে ১৭, সোমবার, আশপাশের বাড়িতে মৃত্যুর বিভীষিকা, সন্তানহারা জননী, স্বামীহীনা স্ত্রী, পিতৃহীন শিশুর মুখ দেখি। গ্রামে গ্রামে মরণলীলা। শহরের পথে পথে সন্ত্রস্ত পথিকের নিঃশব্দ পদচারণা। তবুও হারামজাদারা স্বাভাবিক অবস্থাই বলে যাচ্ছে। শুনি নারীদেহ নিয়ে কামার্ত পশুরা ছিনিমিনি খেলছে। তরুণ তাজা কিশোর যুবকের রক্ত শুষে নিচ্ছে। আল্লাহ্ আর কত শুনাবে, কত দেখাবে। এবারে শেষ কর প্রভু। আজ ইডেন বিল্ডিং এ, মতিঝিলে দুইটি ব্যাংকে ও নিউমার্কেটে টাইম বোমা ফেলে গেছে। কোনও কাগজে খবর বের হবে না জানি।[১]

লেখিকার দিনলিপির এই ক্ষুদ্র অংশকেই যদি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়, তাহলে তৎকালীন অবরুদ্ধ দেশের বেশ কয়েকটি প্রেক্ষাপট খুব সহজেই চলে আসে দৃষ্টিসীমার ভেতর। একদিকে পুরো দেশের প্রতিভু হিসেবে ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তার দোসরদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ও তাণ্ডব। পাশাপাশি এতকিছুর পরও দেশের রাষ্ট্রীয় মুখপত্র বিধায় প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমগুলোর নীরব ভূমিকা। যে নীরবতার শিকল ভেঙে দেশের মানুষকে দেশের সত্যিকারের খবরগুলো যথাসাধ্য পৌঁছে দিতেই সে সময়ের বিক্ষিপ্ত ও স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর যাত্রা শুরু হয় মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়।

[১] সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী থেকে*, (ঢাকা: দৈনিক সংবাদ, নভেম্বর ২৫ ১৯৯৯), পৃষ্ঠা - ১১

সুফিয়া কামালের মতো অবরুদ্ধ বাংলাদেশের একই রকম চিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের অভিজ্ঞতানির্ভর লেখনীতেও। ১৯৯৬ সালে সাহিত্য প্রকাশ থেকে রশীদ হায়দারের সম্পাদনায় প্রকাশিত **১৯৭১ : *ভয়াবহ অভিজ্ঞতা*** শিরোনামের প্রবন্ধ সংকলনে সেলিনা হোসেন রচিত *রুদ্ধশ্বাসের দিনগুলো*তে পাওয়া যায় –

> ... বোমার শব্দ না শুনলে বুক ধরফর করতো। মনে হতো আমরা বুঝি বেঁচে নেই। গেরিলা অপারেশনে সব সাহস পুনরোজ্জীবিত হতো। শহরটা দু'দল মানুষের শহর হয়ে গেছে। একদল বীরদর্পে ঘুরে বেড়ায়। ওদের হাতে অস্ত্র, যা খুশি তা করতে পারে। পঁচিশের রাতের পর থেকেই ওরা তা করছে। একদল ওদের তাঁবেদার হয়েছে। ওদের কথায় ওঠে বসে। ওদেরকে মদদ জোগায়। অন্যদল জীবন হাতের মুঠোতে নিয়ে চলাফেরা করে। বিকেল হতেই শহরের রাস্তাগুলো খালি হয়ে যায়। ওরা মুক্তিবাহিনীর অপেক্ষায় থাকে। যেন এ শহরে কোনও জীবনযাত্রা নেই, সবটাই ফাঁকা। অথচ পঁচিশ তারিখে রাত দশটা পর্যন্ত এ শহরের মানুষগুলো উদ্দাম প্রাণচাঞ্চল্যে কর্মমুখর ছিলো। যেন বঙ্গোপসাগরের প্রবল ঢেউ বয়ে গেছে শহরের আনাচে কানাচে।[২]

অবরুদ্ধ বাংলাদেশের একটা দুঃসহ চিত্রের আংশিক আভাস পাওয়া যায় সেলিনা হোসেনের এই লেখায়। কিন্তু পশ্চিমের তীব্র নিয়ন্ত্রণ ও সেন্সরশিপের জন্য যে বিষয়গুলো পুরোমাত্রায় অনুপস্থিত ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সব সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমের খবরে। যে কারণে বাংলাদেশের সম্যক পরিস্থিতির বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদপ্রত্যাশী সাধারণকে নির্ভর করতে হতো বিদেশি সংবাদমাধ্যমের আহরিত

[২] সেলিনা হোসেন, *রুদ্ধশ্বাসের দিনগুলো*, রশীদ হায়দার (সম্পাদিত), ১৯৭১: *ভয়াবহ অভিজ্ঞতা*, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, মে ১৯৯৬), পৃষ্ঠা - ৫১

Dhaka University Institutional Repository

খবরের ওপর। এ বিষয়ে আবু নাসের রাজীব তার গবেষণায় দেখিয়েছেন,

> অবরুদ্ধ দেশে লোকজন মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর ও অগ্রগতি জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতো এবং নানা উপায়ে তা সংগ্রহও করতো। খবরের জন্য তারা মিলিটারী ও রাজাকারবাহিনীর ভয়ে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে কিংবা খাটের নীচে লুকিয়ে, লেপমুড়ি দিয়ে নানাভাবে বিশেষভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার, বিবিসি, ভয়েজ অব আমেরিকা, আকাশবাণী শুনতো। পাক সামরিক শাসক এ সমস্ত মাধ্যমের খবর শোনাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে এর জন্য দু'বছর কারাদণ্ডের আদেশ জারি পর্যন্ত করেছিলো। এমনকি খবর শোনার অপরাধে অনেককে হত্যা পর্যন্ত করা হতো বলে জানা যায়।[৩]

আবু নাসের রাজীবের এই উদ্ধৃতিতে অবরুদ্ধ ও বিপদ সঙ্কুল দেশের মানুষের নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি দেশের সংবাদের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি উঠে আসে। যে আগ্রহ নিরসনে সমকালীন জাতীয় দৈনিকগুলোর অপারগতাপ্রসূত অনুপস্থিতির অভাব পূরণে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত দৈনিকগুলো এক অনন্য ভূমিকা পালন করে।

দেশের প্রথম সারির পত্রপত্রিকাগুলোর ঠিক বিপরীত চিত্রটিই উপজীব্য বিষয় ছিল মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদপত্রগুলোর প্রকাশিত খবরে। এ বিষয়ে মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক স্বাধীনতা*র সম্পাদক অরুনাভ সরকার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'অবরুদ্ধ দেশের নানান খবরাখবর ও গণহত্যার বিবরণাদি আমরা সংগ্রহ করতাম শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে। এছাড়া সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেয়া মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করতাম বিভিন্ন সময়।'[৪] কিন্তু তৃণমূল

[৩] আবু নাসের রাজীব (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বিবিসি*, (ঢাকা: বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন ও দ্য ব্রিটিশ কাউন্সিল, এপ্রিল ২০০১), পৃষ্ঠা - ১৪৪

[৪] অরুণাভ সরকার, সাক্ষাৎকার ।

পর্যায় থেকে সংগ্রহ করা সেসব তথ্যের যাচাই-বাছাইয়ের কোনো সুযোগ সত্যিকার অর্থে সেসময় সম্ভবপর ছিল না বলে অরুণাভ সরকার আরও বলেন,

> যে ঘটনা ঘটে গেছে, পরে গিয়ে তো সেটা আর যাচাই করার কোনও সুযোগ তখন ছিল না। এসব ক্ষেত্রে যাদের উপরে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যাত ছিলো, তাদের রিপোর্টই গ্রহণ করতাম। বাকিদেরটা গ্রহণ করতাম না। আর আমার পত্রিকায় তো আমি একাই সবকিছু লিখতাম। সম্পাদনা করতাম। সবকিছু এক হাতে করেছি।[৫]

পাশাপাশি ঢাকাকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপর পাকিস্তানি সেনাঅধ্যুষিত সরকারের চাপের একটা বাস্তববাদী চিত্র উঠে এসেছে *সাপ্তাহিক আমোদ* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী রচিত ও ১৯৯২ সালে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *কাগজের নৌকায়*। সেখানে তিনি বিবৃত করেন,

> সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে যায়। কম্পোজিটর নেই, ম্যাশিনম্যান নেই, বিদ্যুৎ নেই, প্রাণের ভয়ে মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামে পালাচ্ছে। কেউ কেউ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এসবের মধ্যে প্রেস চালানো বা পত্রিকা চালানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তারপরও জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সামরিক উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নির্দেশ এলো, শহরের স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ থাকতে হবে। অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের মত প্রেসমালিকদের নির্দেশ দেয়া হল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাদের প্রেস খুলে কাজ আরম্ভ না করলে প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হবে। এই নির্দেশ পাবার পর আমাদের প্রেস মালিকদের মাথায় যেন বজ্রপাত পড়ল।[৬]

যে কোনো মূল্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়ে মেকি স্বাভাবিকতার খবর প্রকাশ ও ঘুণাক্ষরেও যেন বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা নজরে না আসে, সেই চেষ্টাটা অবিরত ছিল সেনা নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানি শাসকদের আচরণে।

[৫] অরুণাভ সরকার, সাক্ষাৎকার।

[৬] মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী, *কাগজের নৌকা*, (কুমিল্লা : ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৬২), উদ্ধৃত: মামুন সিদ্দিকী (রচিত), *মুক্তিযুদ্ধে সংবাদপত্র: আমোদ*, (কুমিল্লা: বিনয় সাহিত্য সংসদ, ডিসেম্বর ২০০০), পৃষ্ঠা - ২০

অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মতোই নির্বিচার গণহত্যা ও নির্যাতনের বিষয়টিও উপেক্ষিত ছিল প্রথম সারির সংবাদপত্র ও বাংলাদেশি সংবাদপত্রগুলোতে। প্রথমবারের মতো ২৫ ও ২৬ মার্চের গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ ও নির্বিচার নির্যাতনের বিষয়গুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে উঠে আসে বিদেশি সাংবাদিক এন্থনি মাসকারেনহাসের মাধ্যমে *সানডে অবজারভার* পত্রিকায় 'গণহত্যা' শিরোনামের বিশাল এক প্রতিবেদনে। তৎপরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অবরুদ্ধ মানুষের জানার জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসরদের দ্বারা পরিচালিত এসব নারকীয় হত্যাযজ্ঞের বিবরণ উপজীব্য হয়ে ওঠে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর খবরেও। এ বিষয়ে জয়বাংলা পত্রিকার রণাঙ্গন সংবাদদাতা ও মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবিব এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

> প্রত্যেকটা কাগজের বিষয়বস্তুগুলো বাস্তবিকভাবে একই ধরনের ছিল। পাকিস্তানিরা কোথায় কোথায় অত্যাচার করলো, কত বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিলো, কতগুলো মেয়েকে তারা অত্যাচার করলো, এবং মুক্তিযোদ্ধারা কি করে তাদের প্রতিরোধ করলো, বাংলাদেশে কিভাবে ইসলামের নাম নিয়ে অত্যাচার করা হচ্ছে, এগুলোই মূলত ছিল খবরে মূল বিষয়বস্তু। কাজেই এখানে ব্যক্তিগত দৈনন্দিন খবরাখবর, মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত সবই আসতো। আর তাই গণহত্যা ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশের যেকোনও খবর অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই উপজীব্য ছিল সংবাদপত্রগুলোর নিয়মিত প্রকাশনায়।[৭]

অবরুদ্ধ বাংলাদেশের নানান খণ্ডচিত্রের পাশাপাশি সে সময় মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোতে গণহত্যার বিষয়টিও যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে উল্লেখ করে হারুন হাবিব তার সাক্ষাৎকারে বলেন,

> গণহত্যার বিষয়টা খুব প্রকাশ্যে বেশি করে এসেছে। এবং দেশে পাকিস্তানিরা এবং তাদের বঙ্গীয় দোসর আলবদর রাজাকাররা যে অত্যাচার নির্যাতন করেছে এগুলো খুব সচিত্রভাবে এসেছে। সে সময় ক্যামেরা খুব একটা প্রচলিত যন্ত্র না হলেও যার কাছেই

[৭] হারুন হাবীব, সাক্ষাৎকার ।

Dhaka University Institutional Repository

> ক্যামেরা ছিল সেই তা বহন করতো তথ্য সংগ্রহের একটা শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে। যদিও ক্যামেরাবাহীদের সংখ্যাটা ছিল অপ্রতুল। আমার কাছে একটা ক্যামেরা ছিল বিধায় আমি বিভিন্ন গণহত্যা ও নির্যাতন নিপীড়নের ছবি খবরের কাগজের পাতায় তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলাম। আমার মতো অনেক মুক্তিযোদ্ধাই অপারেশনের সময় ক্যামেরা নিয়ে যেতো। অনেক ছবিও তারা এনেছে।[৮]

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর খবরে অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও গণহত্যার যে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাতে একটা বিষয় সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। মূলত পশ্চিম পাকিস্তানিদের নির্মম নির্যাতনের বিষয়টি উপস্থাপনের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যটি যেমন একদিন থেকে ছিল প্রবল পাশাপাশি বিভিন্ন শরাণার্থী শিবির ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আটকেপড়া সাধারণ মানুষের সামনে সমগ্র দেশের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরাও ছিল সেসব প্রকাশনার একটি মূল উদ্দেশ্য।

[৮] হারুন হাবীব, সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায়

অবরুদ্ধ বাংলাদেশ

এ অংশে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোতে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের বাস্তবিক চিত্র তুলে ধরে যে সংবাদগুলো প্রকাশিত হয় সেগুলো থেকে বাছাই করে কয়েকটি সংবাদ প্রতিবেদন এখানে উপস্থাপন করা হলো। যে সংবাদগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক পরিস্থিতি, ঢাকা শহরে বন্দি নির্যাতন, কারফিউকালীন অবস্থাসহ অন্যান্য অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে।

ছাত্রবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, ৮ই সেপ্টেম্বর সর্বশেষ সূত্র থেকে জানা গেছে যে, এ–হিয়ার দখলিকৃত আলোকার ছাত্র-ছাত্রীরা কার্যত; স্কুল কলেজ বয়কট করে চলছেন। গত কয়েকদিনের মধ্যে শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০ জন অধ্যাপককে গ্রেপ্তার নয়তো সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আহম্মদ শরীফ ও ইংরেজী বিভাগের আহসানুল হকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ হাজার ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৩০/৪০ জন ছাত্র ক্লাসে আসছে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ হাজার ছাত্রের মধ্যে উপস্থিতির সংখ্যা ১৬ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ হাজারের মধ্যে মাত্র ১৭ জন উপস্থিত থাকে। ঢাকা ল'কলেজের ৭০০, নটরডাম কলেজের ১ হাজার, জগন্নাথ কলেজের ১০ হাজার ছাত্রের মধ্যে কেহ ক্লাসে যোগদান করছে না।

জন্মভূমি ॥ ১: ৮ ॥ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

ঢাকা শহর বন্দীশিবিরে পরিণত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ইয়াহিয়ার দস্যুবাহিনী ঢাকা শহরকে এখন কার্যত; বন্দীশিবিরে পরিণত করিয়াছে। উপর্যুপরি কম্যান্ডো ও গেরিলা আক্রমণে ভীত হইয়াই এই ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুক্তি বাহিনীর তৎপরতা বন্ধ হয় নাই। পাকিস্তানি বাহিনী শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করিতেছে। বুড়িগঙ্গা নদীতে সশস্ত্র টহলদার বাহিনী গানবোট ও লঞ্চযোগে দিবারাত্র ঘোরাফেরা করিতেছে। শহরের সহিত অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ একেবারে নাই বললেই চলে। শহর হইতে বাহিরগামী সড়ক সমূহের প্রবেশপথে সশস্ত্রবাহিনী ও কড়া চেকপোস্ট ব্যকস্থা মোতায়েন করা হইয়াছে। সেনাবাহিনীর কঠোর নিয়ন্ত্রণে ঢাকা ও বরিশালের মধ্যে লঞ্চ চলাচল করিতেছে। ইহাও আবার অনিয়মিত। সন্ধ্যা হইলেই স্থল ও জলপথে যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। পানির ট্যাঙ্কসমূহও বিদ্যুতকেন্দ্রগুলিতে সেনাবাহিনীর ২৪ঘণ্টা প্রহরা মোতায়েন রহিয়াছে। সেনাবাহিনীর লোকেরা জামাতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের রাজাকার গুণ্ডাদেরকে লইয়া বিভিন্ন রাত্রে বিভিন্ন মহল্লা ঘেরাও করে ও তল্লাশি চালায়। সাধারণত; যেসব এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়া থাকে, সেইসব এলাকাতেই এই ধরনের অভিযান চালান হয়। কিন্তু ইহাতেও শহরবাসীর মনোবল দমিয়া যায় নাই। মুখ ফুটিয়া প্রকাশ্যে হয়তো তাহারা কিছু করিতে পারিতেছে না, কিন্তু শত্রুকে চরম আঘাত হানার সংকল্প তাহাদের দৃঢ়তর হইতেছে।

নতুন বাংলা ॥ ১: ৫ ॥ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

দখলীয় এলাকায় পাকিস্তানি প্রশাসন অচল

মুজিবনগর হতে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল যে- সদ্য আগত শরণার্থীরা বলেন- বেশকিছুদিন আগে থেকেই পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে প্রচার করছিলেন যে খুব শীঘ্রই সামরিক শাসনের অবসান ঘটাবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং রংপুর থেকে যে সমস্ত খবর পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে ঐ সকল জেলার সরকারী অফিস, কাছারী এবং আদলতে শতকরা ২৫ জনের বেশী কর্মচারী কাজে যোগদান করেন নি। জনৈক শরণার্থী বলেন যে, ফরিদপুর শহরের আদালতে একজন বিচারকও নেই - শুধুমাত্র দুইজন সামরিক অফিসার আদালতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এদের কাছে এখনও বিচারের জন্য কোনও মামলা আসেনি। এ অবস্থায় টিক্কা খানের স্থলে ডাঃ মালিককে গভর্ণর করায় কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। রংপুরের সংবাদে জানা যায় যে এখানকার জজ ও মুন্সেফ পালিয়ে গেছেন। কয়েকজন অবাঙ্গালী অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু লোকের আস্থা ফিরে আসছে না। ঢাকায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ যে – সেখানকার অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা ব্যবসা গোটাবার তালে আছেন। মেয়েছেলেদের তারা পূর্বেই করাচিতে স্থানান্তর করেছেন। বাঙ্গালীরা কোনও অবাঙ্গালী দোকানে যান না।

মুক্তবাংলা ॥ ১: ১ ॥ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

ঢাকার পতন আসন্ন

৪ ডিসেম্বর আমাদের রণাঙ্গন প্রতিনিধি জানিয়েছেন, মুক্তিবাহিনীর অমিত বিক্রমী যোদ্ধারা ঢাকা নগরীর মহম্মদপুর আবাসিক মডেল স্কুলের মধ্যে মাইন বিস্ফোরন করেছেন। ফলে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ও ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ঢাকা শহরে মুক্তিবাহিনীর প্রবল আক্রমণে পাঁচটি বিদ্যুত সরবরাহ কেন্দ্র বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ৪০ জন গুলিবিদ্ধ পাক সেনা ঢাকা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ঢাকা বিমান বন্দরের ওপর মুক্তিফৌজের বীর সেনানীরা আক্রমণ চালিয়ে প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে। সহস্র সহস্র মুক্তিবাহিনী, পাক হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া আধুনিক অস্ত্রের সুসজ্জিত মুক্তিবাহিনী, সর্বত্র বিজয়ের পথে বীর বিক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে। পাক হানাদারদের নেতা নিয়াজী স্বীকার করেছিলেন যে ঢাকায় দুই হাজার গেরিলা আছে। প্রকৃতপক্ষে আছে হাজার হাজার, এবং এরা শীঘ্রই ঢাকা মুক্ত করবে।

বিপ্লবী বাংলাদেশ ॥ ১: ১৬ ॥ ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

কারফিউর অন্তরালে

জঙ্গীশাহী কর্তৃক গত ১৭ই নভেম্বর ঢাকা শহরে পূর্বঘোষণা ছাড়া কারফিউ জারি করে হানাদান সৈন্যরা সারা শহরে ২৫ শে মার্চের স্টাইলে পুনরায় নারী ধর্ষণ, হত্যা ও লুণ্ঠন চালায়। মুক্তিবাহিনীর সাহসী যোদ্ধারা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা রেখে টিকাটুলী, লালবাগ, রাজারবাগ, সূত্রাপুর এলাকায় জঙ্গী সৈন্যদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি আক্রমণ চালান। এ আক্রমণে শত্রুসৈন্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। হানাদার সৈন্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে গেরিলা যোদ্ধাদের গ্রেফতারের নাম করে দেড় শতাধিক নিরীহ যুবককে ক্যান্টনমেন্টে আটক করে। পরে এসকল তরুণদের হত্যা করা হয়। এই সান্ধ্য আইনের মাত্র ৪৮ ঘণ্টা পরে মুক্তিবাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে প্রচণ্ড মর্টার আক্রমণ চালিয়ে রামপুরার টেলিভিশন ট্রান্সমিশনের কাছে জামাতে ইসলামীর একজন কুখ্যাত নেতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। ওইদিনই গেরিলা যোদ্ধারা ঢাকা শহরে প্রচণ্ড গোলাগুলি ও বোমাবর্ষণ করে আরও দুইজনকে খতম করে ও ২৪ জনকে গুরুতররূপে আহত করেন বলে এপি'র খবরে জানা গেছে। বিবিসির এক খবরে প্রকাশ, গত ২৯ শে নভেম্বর হানাদান সৈন্যদের ব্যাপক

প্রহরার মধ্যেই শান্তিনগরে অবস্থিত কেন্দ্রিয় চলচ্চিত্র দপ্তরে প্রকাশ্য দিবালোকে গেরিলা যোদ্ধাদের বোমা বিস্ফোরণের ফলে খান সেনাদের পদলেহী দালাল কর্মচারী গুরুতররূপে আহত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা সম্প্রতি খানসেনাদের পদলেহী দুইজন ডাক্তারকে গুলি করে হত্যা করেছেন।

জয় বাংলা (১) ॥ ১: ৩০ ॥ ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১

বেগম মুজিবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

ঢাকা মুক্ত হবার পর বেগম মুজিবর রহমান অশ্রুসিক্ত নয়নে নিজের বাসভবন থেকে নীচে নেমে আসেন। এবং বাংলার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বেগম রহমান জানান, পাক সৈন্যবাহিনী তাদের বাড়ির চতুর্দিক ঘিরে রেখেছিল। পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের পরও খান সেনারা গুলি চালিয়ে একজন মহিলাসহ ৬জন লোককে নিহত করেছে। দীর্ঘ আট মাসাধিক কালের অত্যাচার উৎপীড়নের কাহিনীও বেগম রহমান সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন।

বিপ্লবী বাংলাদেশ ॥ ১: ১৮ ॥ ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এবং তার সহযোগী সংস্থা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের এসব খবরের সাধারণ চিত্রগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই যে বিষয়টি বোধগম্য হয়, প্রকাশিত এসব সংবাদে বিচ্ছিন্নভাবে সেই সময়ের অবরুদ্ধ বাংলাদেশের তথ্যের পাশাপাশি মুক্তিবাহিনীর সফল কার্যক্রমের বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এসব সংবাদপত্র। পাশাপাশি এসব খবরের শব্দ চয়ন ও ভাষার প্রয়োগের বিষয়টিও যে সুচিন্তিতভাবেই যোদ্ধাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির একটি বিশাল নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে সেটাও সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আর তৎসঙ্গে এসব তথ্যের প্রাপ্তির দিক বিবেচনা করলে একদিকে যেমন শরণার্থী শিবিরের আশ্রিত কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরিত বার্তাকে খবরের উৎস হিসেবে পাওয়া যায়। অন্যদিকে বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের প্রেরিত সংবাদদাতাদের বয়ানে যেসব রিপোর্টগুলো প্রকাশ করেছে, সেগুলো থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হতো এসব সংবাদপত্রের খবরাখবরে।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায়

নির্যাতন ও গণহত্যার বিবরণ

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোতে দেশজুড়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ও তার মদদপুষ্ট স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের নির্যাতন ও গণহত্যার চিত্রসংবলিত সংবাদগুলোর এখানে উপস্থাপন করা হলো। যে সংবাদগুলোতে বাঙালি নারী নির্যাতন, গণহত্যা এবং দেশজুড়ে চালানো নৃশংসতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

পাক সেনার নির্বিচারে গণহত্যা

কিছুদিন পূর্ব্বে নওগাঁ মহকুমার আতাইকুলা গ্রামে অগ্নিসংযোগ– কয়েকলক্ষ টাকা ও সোনা লুণ্ঠন এবং ৫২ জনকে হত্যা– তৎসহ নারীধর্ষণের ফলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। লাকসাম থেকে ফেনি যাওয়ার পথে বর্ব্বর পাক ফৌজ কয়েকটি গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। নওগাঁর উত্তর অঞ্চলে কয়েকজন নারীর ওপর পাশবিক নির্যাতনের ফলে তিনজনের মৃত্যু ঘটে। প্রায় দুই হাজার ভারতগামী বাঙ্গালীদের ওপর পাকসেনা ও বিহারীদের আক্রমণের ফলে বহুজনের মৃত্যু ঘটে– কয়েকজন নারীকে অপহরণ করে এবং লুণ্ঠন করে সকলকে সর্ব্বশান্ত করে। বগুড়া জেলার আদমদিঘী, তালোড়া, নশরৎপুর প্রভৃতি এলাকায় অগ্নিসংযোগ করে এবং গোলাগুলি দ্বারা তিন শতাধিক নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করে, এছাড়া নওগাঁ, নাটোর, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি স্থানের গ্রামগুলিতে প্রবেশ করে– তারা অকথ্য নির্যাতন ও লুণ্ঠন চালায়। তাদের ভয়ে লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

বঙ্গ বাণী ॥ ১: ১ ॥ ২৩ মে ১৯৭১

আন্তর্জাতিক বিচার কমিশন গঠনের দাবী

বৃটিশ পার্লামেন্টের অন্যতম সদস্য মি: জন স্টোন হাইস বাংলাদেশে পাক জল্লাদদের নৃশংস গণহত্যার বিচার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বিচার কমিশন গঠনের জন্য জাতিসংঘের কাছে দাবী জানিয়েছেন।

মিস্টার স্টোন হাউস বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে জাতিসংঘ বাহিনী প্রেরণের জন্যও প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে যে পৈশাচিক নৃশংসতা চলছে হিটলারের নৃশংসতা ছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এরকম আর কোন দৃষ্টান্ত নেই। আয়ারল্যান্ড পার্লামেন্টের সদস্য কোনার্ড ব্রায়েল বাংলাদেশে পাক সৈন্যদের গণহত্যার বিষয় আলোচনা করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে জাতিসংঘের সভা আহ্বানের দাবী জানিয়েছেন।

জয়বাংলা (১) ॥ ১: ৯ ॥ ৯ জুলাই ১৯৭১

নারী নির্যাতনে পাকফৌজের ঘৃণ্য পদ্ধতি

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

এক বিশ্বস্ত খবরে জানা গেছে যে গত ক'দিন পূর্বে বর্বর পাক সেনারা একদল বাঙ্গালী নারীকে উলঙ্গ করে সমস্ত পাক হিলি বাজারে বেড়াতে বাধ্য করে। এ ঘৃণ্য পৈশাচিক

Dhaka University Institutional Repository

দৃশ্য দেখতে না পেরে লোকজন সঙ্গে সঙ্গে বাজার ত্যাগ করেন। পরবর্তী এক সংবাদে জানা যায় ঐ সমস্ত নারীদের মধ্যে অনেকে আত্মহত্যা করেছেন।

স্বাধীন বাংলা (৩) ॥ ১: ৭ ॥ ১২ জুলাই ১৯৭১

এমন বর্বরতা জীবনে দেখিনি

'পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর যে নির্মম অত্যাচার হয়েছে, আমি অতীতে কখনও তা প্রত্যক্ষ করিনি।' যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন উপমন্ত্রী জনাব আলী হাফিজ গত রবিবার কলকাতায় এ কথা বলেন। জনাব হাফিজ বিশ্ব স্কাউট ব্যুরোর সদস্য এবং আরব স্কাউট লীগের সভাপতি। তিনি শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে কলকাতায় ফিরে গিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি নিজের চোখে শরণার্থীদের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার চিত্র দেখে এসেছি। যারা শরণার্থীদের এই পরিস্থিতির মধ্যে টেনে এনেছে তাদের মানবিকতার কোনও বালাই নেই।'

জয়বাংলা (১) ॥ ১: ১৬ ॥ ২৭ আগস্ট ১৯৭১

নারী ধর্ষণ

রৌমারী: ১০ ই সেপ্টেম্বর –
অধিকৃত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ উলিপুর থানার বনগ্রাম অঞ্চল হতে গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে কিছু সংখ্যক পাক সেনা এগার জন মহিলাকে বলপূর্বক হরণকরত: ধর্ষণ করে।

অগ্রদূত ॥ ১: ১৩ ॥ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

ক্ষমা প্রদর্শনের নামে নৃশংসতা

৯ই সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশ। আমাদের সীমান্ত প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, পাক বেতারের মিথ্যা প্রচারণা এবং পাক প্রেসিডেন্টের তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনে বিশ্বাস করে পশ্চিম বাংলায় আশ্রয়প্রাপ্ত একজন অধ্যাপক সহ চারজন বিশিষ্ট নাগরিক তাদের আত্মীয় স্বজনকে দেখবার জন্য সীমান্ত পেড়িয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিলেন। এদের ৫ জনকেই হানাদার শত্রুসৈন্যরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

বিপ্লবী বাংলাদেশ ॥ ১: ৬ ॥ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

আলতাফ মাহমুদ গ্রেফতার

সম্প্রতি বাংলাদেশের জনপ্রিয় প্রগতিশীল সংগীতশিল্পী ও সংগীত পরিচালক জনাব আলতাফ মাহমুদকে পশ্চিম পাকিস্তানি ভাড়াটিয়া সামরিক বাহিনী তাহার রাজারবাগস্থ বাসভবন হইতে গ্রেফতার করিয়াছে। খবরে আরও প্রকাশ যে, গ্রেফতারের পর তাহার ওপর চরম দৈহিক নির্যাতন করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ ॥ ১: ১১ ॥ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

হত্যা

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পাক দস্যুরা নয়নপুর ও তালাবরের ১৬ জন সাধারণ নাগরিককে ধরে নিয়ে যায় এবং তিনদিন ছাউনীতে রাখার পর চতুর্থ দিনে সারি বেঁধে দাঁড় করায়ে মেশিনগানের গুলিতে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সাক্ষীস্বরূপ এক ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে রেখে বলা হয় "তুমি গ্রামে গিয়ে প্রচার কর কিভাবে এদেরকে হত্যা করা হল।" নৃশংসতার এমন নজির আর কোথাও দেখা যায়নি।

জাগ্রত বাংলা ॥ ১: ৩ ॥ ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় আবার গণহত্যা

গত ১৩ই নভেম্বর অধিকৃত ঢাকা ও নারায়গঞ্জ শহরে পাকিস্তানের জঙ্গীচক্র পুনরায় কার্ফিউ জারী করে। মুক্তি সংগ্রামীদের আক্রমণে নাজেহাল হয়ে জঙ্গীশাহী দুটো শহরেই ২৫ মার্চের কায়দায় জনসাধারণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোনও একটি দালালী সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মুক্তি সংগ্রামীদের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করে তারা বাড়ী বাড়ী তল্লাশি চালায়। প্রকাশ, তাদের না পেয়ে পাক সৈন্যরা বহুসংখ্যক নিরীহ লোককে হত্যা করে, অনেকের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায় এবং বেশকিছু সংখ্যক নির্বিরোধ নাগরিক ও স্কুল কলেজের ছাত্রকেও ধরে নিয়ে যায়। ফলে কার্ফিউ তুলে দেবার পরপরই জনসাধারণ নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেন। এবারকার অভিযানে শত্রুসেনা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। সরাসরি সংঘর্ষে দুই পক্ষেই প্রচুর হতাহত হয় বলে জানা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মুক্তিসংগ্রামীরা বহু এলাকাকেই শত্রুকবলমুক্ত করেছেন। নোয়াখালীতে একটি এফ ৮৬ পাকিস্তানি জেট প্লেনও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে। পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন যে, জঙ্গী শাহী বিশ্ব জনমতকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্যে ২৭ শে ডিসেম্বর ইসলামাবাদে জাতীয় পরিষদের যে গোঁজামিল অধিবেশন বসানোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে সেটা পুরোপুরি বানচাল করে দিয়ে তার আগেই বাংলাদেশের সর্বত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন চালু করার জন্যে মুক্তিবাহিনী যে দুর্বার অভিযান চালিয়েছেন ঢাকার এই সরাসরি সংঘর্ষ তারই একটি অংশ।

অভিযান ॥ ১: ১ ॥ ১৮ নভেম্বর ১৯৭১

মুক্তিযুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও সেখানকার নির্বিচার গণহত্যা, লুণ্ঠন ও নির্যাতন-নিপীড়নের যে আংশিক চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে তা সামগ্রিক বিচারে অপ্রতুল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র অংশের বিশ্লেষণাত্মক বিচারে বোঝা যায়, সারাদেশের প্রত্যন্ত পর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের মদদপুষ্ট দোসরদের ক্রিয়াকলাপ যথেচ্ছই অমানবিক উপায়ে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য লিপ্ত ছিল। স্বীয়স্বার্থসিদ্ধির এই কুচক্রে যুদ্ধনীতির কোনো সুবিন্যস্ত উপায়ের প্রতিফলন দূরের কথা, বরং যে কোনো মূল্যে এই ভূখণ্ডের মানুষকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পদাবনত রাখার প্রয়াসেই এই অপকর্ম সাধিত হয়েছে। কিন্ত তা সত্ত্বেও ঢাকাকেন্দ্রিক কোনো সংবাদমাধ্যমে সেগুলোর প্রতিফলন দেখা যায়নি। কারণ পাকিস্তানি জান্তাদের নিয়ন্ত্রিত এসব পত্রিকা যান্ত্রিকভাবে কেবল সরকারি মুখপত্রের কাজ করেছে। বহির্বিশ্বে তৎকালীন পাকিস্তানের অখণ্ডতা প্রমাণের মাধ্যম হিসেবে। কিন্তু একদিকে বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রেরিত সংবাদকর্মীদের প্রতিনিধিদের সরেজমিন প্রতিবেদন অন্যদিকে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদপত্রগুলোর সংগৃহীত তথ্যাদির মাধ্যমে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের গণহত্যা, লুণ্ঠন, নির্যাতন-নিপীড়নের চিত্র ঠিকই পৌঁছে গেছে মুক্তিকামী জনগণ এবং বহির্বিশ্বের কাছে।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায়

মুক্তিযোদ্ধাদের দিনলিপি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শুধু পাকিস্তানি সেনা সমর্থিত সরকার কিংবা তাদের নিযুক্ত এ দেশীয় দোসর ও দালালচক্রের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র সংগ্রাম বলে বিবেচিত করলে তা পুরো স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি খণ্ডচিত্রই উপস্থাপিত হবে। নির্যাতিত, নিপীড়িত সাধারণের গণসংযুক্তিতে একটি সমগ্র জাতির জনযুদ্ধের যে সামগ্রিক চিত্র, সেটিই মূলত পরিলক্ষিত হয় নয় মাসের সমগ্র দেশব্যাপী সংঘটিত গণমানুষের স্বাধীনতা আদায়ের সংগ্রামে। সামষ্টিক উপায়ে এই জনযুদ্ধকালীন সময়ে 'মুক্তিযোদ্ধা' শব্দটির প্রায়োগিক অর্থ বিচারে ব্যাপক ও সংকীর্ণ দুই উপায়েই সংজ্ঞায়িত করার সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায় মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী বিভিন্ন রচনায়। ব্যাপক অর্থে এই ভূখণ্ডের মানুষ যারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যে কোনো উপায়েই মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের অবস্থানে অটল ছিলেন, এমনকি যারা অসহনীয় পাকিস্তানি বর্বর হামলার শিকার হয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন সীমান্তবর্তী শরণার্থী শিবিরগুলোতে, তারাও এই অর্থে মুক্তিযোদ্ধার সম্মান পেয়ে থাকেন। শুধু তাই নয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রবাসী বাঙালি যারা কিনা মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিমা সেনাবাহিনীর চালানো হত্যা-লুণ্ঠনের চিত্র বিশ্বব্যাপী তুলে ধরে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বজনমত প্রতিষ্ঠা ও কূটনৈতিক সমর্থন আদায়ে নিরলস পরিশ্রম চালিয়ে গেছেন, সে অর্থে তারাও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিবেচিত। তবে সংকীর্ণ অর্থে যারা পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধে নিযুক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়েছেন তাদেরকে 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রচলন রয়েছে। পরিসর সীমিত রাখার জন্য বর্তমানে গবেষণাপত্রেও সশস্ত্র যুদ্ধের যোদ্ধাদের কথাই তুলে আনা হয়েছে। রৌমারী মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত অগ্রদূত পত্রিকার সম্পাদক আজিজুল হক এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন,

> চিলমারী ছোট ছোট অপারেশন হত। একবার মুক্তিযোদ্ধারা অনেকগুলো রাজাকার ধরে নিয়ে আসলো। ২৫-৩০ জনকে একসঙ্গে। ওদের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলাম, ওরা মুক্তিযুদ্ধ কি সেটাই বোঝে নাই। ওদেরকে উল্টা বোঝানো হয়েছে। ওদের কাউকেই মারা হলো না। বরং ওদেরকেই আমরা মুক্তিযোদ্ধা বানালাম। মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-রান্না-বান্না বা সহায়তার কাজ করানো হত। যদিও ওদের হাতে রাইফেল তুলে দেয়া

> হয়নি। দলে দলে মানুষ ওদেরকে দেখতে আসতো। কর্নেল তাহের তখন ওখানে ছিলেন। তাহের সাহেব আমাকে বললেন যে ওই লোকগুলাকে মারা যাবে না। দেখি এই লোকগুলাকেই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে আদর্শায়িত করা যায় কি না। সৌভাগ্যক্রমে ওদের কেউ আর বেঈমানি করেনি আমাদের সাথে। ওরা কম শিক্ষিত লোক বলেই ওদেরকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ডুবিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল পাকিস্তানি দোসরদের।[১]

এ রকম মুক্তিযুদ্ধকালীন অনেক ছোট ছোট ঘটনাই সে সময় স্থান করে নিয়েছিল অগ্রদূতের মতো অন্যান্য পত্রপত্রিকাগুলোতেও। এ বিষয়ে জয়বাংলা পত্রিকার রণাঙ্গন সংবাদদাতা হারুন হাবিব সহমত প্রকাশ করে বলেন,

> পাকিস্তানিরা কোথায় কোথায় অত্যাচার করলো, কত বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিলো, কতগুলো মেয়েকে তারা অত্যাচার করলো, এবং মুক্তিযোদ্ধারা কি করে তাদের প্রতিরোধ করলো, বাংলাদেশে কিভাবে ইসলামের নাম নিয়ে অত্যাচার করা হচ্ছে, এগুলোই মূলতঃ ছিল খবরে মূল বিষয়বস্তু। কাজেই এখানে ব্যক্তিগত দৈনন্দিন খবরাখবর, মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত সবই আসতো। আর তাই গণহত্যা ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশের যেকোনও খবর অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই উপজীব্য ছিল সংবাদপত্রগুলোর নিয়মিত প্রকাশনায়।[২]

পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে এদেশের সশস্ত্র আন্দোলনের অগ্রণী সেনানিদের একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য বরাবরই ছিল চোখে পড়ার মতো। একদিকে পাকিস্তানি প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল সেনা, অন্যদিকে ২৫ মার্চ পরবর্তী সময়ে ঢাকা ও দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা বিভিন্ন পেশাজীবী তরুণদের নিয়ে আগরতলায় মেজর খালেদ মোশাররফের পরিচালনায় মাত্র কয়েকদিনের রণকৌশল শেখা গেরিলা যোদ্ধাবাহিনী। একদিকে দোসরদের আয়োজনে নানা সুবিধালোভী বিলাসবহুল খাদ্যসুবিধা পাওয়া পাকিস্তানি সেনা সদস্য। অন্যদিকে দিনরাত পালিয়ে বেড়ানো, অনাহারি-অর্ধাহারি, রোদ-জল-বৃষ্টিতে ভেজা এক একজন তরুণ প্রাণ। কিন্তু দেশমাতৃকার হারানো সম্ভ্রম রক্ষার যে অদম্য ক্রোধ সেই তরুণদের উজ্জীবিত করেছিল, সেটার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অবকাশ রাখে না।

[১] আজিজুল হক, সাক্ষাৎকার ।

[২] হারুন হাবীব, সাক্ষাৎকার ।

২০০৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর *দৈনিক জনকণ্ঠের* বিজয় দিবসের বিশেষ সংখ্যায় *স্মৃতি '৭১ ও ক্ষুদে মুক্তিযোদ্ধা* শীর্ষক প্রবন্ধে শিল্পী হাশেম খান লিখেছেন,

> ঢাকা শহরের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ, প্রতিরোধ বা গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে ঢাকাবাসী বাঙালিদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করে রেখেছিল একদল টগবগে তরুণ মুক্তিযোদ্ধা। যারা পাক হানাদার ও বর্বর সেনা বাহিনীর ২৫ মার্চ কালোরাত্রির হত্যাযজ্ঞ ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দেবার পর ঢাকা ছেড়ে চলে এসে জড়ো হয়েছিল আগরতলায়। তৎকালীন বিদ্রোহী বাঙালি সেনা অফিসার মেজর খালেদ মোশারফ দেশের তরুণ মেধাবী ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, শিল্পী তথা সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্বাধীনতাকামী মানুষদের নিয়ে মাত্র তিন মাসেই বিচক্ষণ সাহসী ও বুদ্ধিমত্তায় এক শক্তিশালী গেরিলা বাহিনী তৈরি করে ফেললেন। তিনি তাদের সুকঠিন ট্রেনিংয়ের মধ্যে বলেছিলেন – বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়তো চলবে অনেকদিন ধরে। নিয়মিত সেনাবাহিনী যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। তাদের সহযোগিতা করার জন্য ও দেশের আপামর জনতাকে যুদ্ধে সম্পৃক্ত করার জন্য, সাহস মনোবল দৃঢ় রাখার প্রয়োজনে নিয়মিত যুদ্ধের পাশাপাশি গেরিলা যুদ্ধও চালিয়ে যেতে হবে।[৩]

রণকৌশল প্রশিক্ষণের সেই সাহস ও উদ্দীপণা সঞ্চয়কারী কথাগুলোই অকুতোভয় অসীম সাহসী তরুণ প্রাণের মধ্যে সঞ্চার করেছিল স্বাধীনতার এক অমিত সম্ভাবনা। যে সম্ভাবনা আশার সঞ্চার করে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের মনেও। ঠিক যে কারণে এসব মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সারা দেশের সাধারণ মানুষের সমর্থন ও ভালোবাসার দিকটিও ছিল চোখে পড়ার মতো। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাজারো সতর্কবাণী আর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষই এসব মুক্তিযোদ্ধাকে সাহায্য করেছে সামর্থ্য ও সাধ্য অনুযায়ী। কখনো খাদ্য, কখনো চিকিৎসা কিংবা কখনোবা সামান্য কিছুক্ষণের বিশ্রামের জন্য জায়গা দিয়ে। তার জন্য অবশ্য মাসুলও গুনতে হয়েছে অনেককেই। রাজাকার আর আলবদরদের দেয়া গোপনসূত্রে এসব বিষয় পাকিস্তানি সেনাকুঞ্জে পৌঁছলে অত্যাচারের খড়্গ নেমে আসত সেসব সাধারণের ওপর। কিন্তু তাতে বাংলাদেশি সেসব মুক্তিকামী জনস্রোতের স্বাধীনতা লাভের অভিপ্রায় কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আত্মিক সমর্থনের বিষয়টি সামান্যতমও প্রভাবিত হয়েছে বলে প্রমাণ মেলে না।

[৩] হাশেম খান, *স্মৃতি '৭১ ও ক্ষুদে মুক্তিযোদ্ধা*, (ঢাকা : দৈনিক জনকণ্ঠ, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৬ ডিসম্বর ২০০৩), পৃষ্ঠা - ২০

একই প্রসঙ্গে দৈনিক *প্রথম আলো*তে ২০০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হারুন হাবিব রচিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভারতীয় বাহিনী* শীর্ষক প্রবন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জে.এস. অরোরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রসঙ্গে বলেছেন,

> তাদের মূল ভূমিকা ছিল জনগণের মনোবল অটুট রাখা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ সহায়তা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা। নিয়াজী মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে যিনি সামরিকভাবে বেশিকিছু ভাবেননি-তাকেও পরে নিজমুখে একথা স্বীকার করতে হয়েছে: ওরা তাকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছিল। এছাড়া নিয়াজী আমাদের অভিযান সম্পর্কে জনগণের কাছ থেকে কোনও তথ্যই আদায় করতে পারেনি। কিন্তু আমরা যেখানেই গিয়েছি যথাসাধ্য সহায়তা পেয়েছি।[৪]

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর প্রধানের দেয়া এই বাণী একটি বিষয়কে স্পষ্ট করে দেয় যে, মুক্তিযোদ্ধা তরুণদের প্রতি আপামর জনসাধারণের আস্থা ছিল অনেক যা যৌথ বাহিনীর সামরিক অগ্রযাত্রাকে সুগম করে তুলেছিল দিন দিন। ঠিক তেমনিভাবে পাকিস্তানি আগ্রাসী বাহিনীর পথচলাটা দিন দিনই রুদ্ধ হয়ে পড়ে জনমনের বিরূপ অবস্থানের কারণে। অল্পসংখ্যক দালাল যেমন রাজাকার ও আলবদর বিপরীত ভূমিকা পালনের অপচেষ্টা চালালেও সেটা সামগ্রিকতার বিচারে জনসমর্থন পায়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এই জনসমর্থন তৈরির ক্ষেত্রে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত সংবাদ কিংবা সম্পাদকীয়গুলোর ভূমিকাও ছিল অনস্বীকার্য। আজকের দিনে বিশ্বব্যাপী মিডিয়া সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বলা হয়, মিডিয়া কিংবা ভাষান্তরে প্রচারমাধ্যম সমাজে নায়কের জন্ম দেয়। বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায়, একজন নায়কের নায়কোচিত বিষয়াদিগুলো সংবাদমাধ্যম তার সংবাদের মাধ্যমে জনমনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে সেই চরিত্রটিকে সামাজিকভাবে করে তোলে সর্বজন আদর্শ।

[৪] হারুন হাবিব, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী (সাক্ষাৎকার : লে: জেনারেল জে. এস. অরোরা)*, (ঢাকা : দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ ডিসম্বর ২০০৬), পৃষ্ঠা - ৪

Dhaka University Institutional Repository

সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেই চরিত্রের মধ্যে নায়কোচিত গুণ থাকা অত্যাবশ্যক, কিন্তু সেই গুণবিশিষ্ট বহুজণের মধ্য থেকে একজনকে জনপ্রিয়তার আলোয় নিয়ে আসার মতো দুঃসাধ্য কাজ একমাত্র প্রচার কিংবা সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রেই সম্ভব তার শক্তিশালী তৎপরতার দ্বারা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর সংবাদ প্রকাশের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে এই বিষয়টিও বেশ ভালোভাবেই পরিলক্ষিত হয়। সংবাদের মূল স্রোতে সারা দেশে চলমান সংঘর্ষ, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরিচালিত হত্যা-লুণ্ঠন-ধর্ষণের চিত্র যেমন উঠে আসত, ঠিক তেমনি নিয়মিতভাবেই তুলে আনা হতো রণাঙ্গনের সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা। সামগ্রিক যুদ্ধবিগ্রহের সামষ্টিক চিত্র তো বটেই, পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনাচরণ, দিনলিপি, দেশপ্রেম, যুদ্ধজয়ের গল্প, বীরত্বের গল্প, কষ্ট-দুঃখের কথা আর নানা ব্যক্তিগত অনুভূতির কথাও তুলে আনা হতো সেসব পত্রপত্রিকার নিয়মিত আয়োজনে। এসব প্রকাশিত খবর একাধারে যেমন অনুরণিত করেছে সারা দেশের মানুষকে তেমনি সমগ্র দেশের মানুষের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের যে অবস্থান তাকে গুণান্বিত করেছে বহুগুণ।

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায়

মুক্তিযোদ্ধাদের দিনলিপির খবর

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোতে নিয়মিতভাবে রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা উঠে আসত সংবাদ কিংবা ডায়েরি আকারে। কখনো তা যুদ্ধপরিস্থিতি বিষয়ক হলেও মাঝে মাঝে একান্ত ব্যক্তিগত ও আবেগতাড়িত মনোভাবের প্রকাশও দেখা যায় ওইসব সংবাদে। তেমনি কিছু প্রকাশিত সংবাদের খণ্ডচিত্র তুলে আনা হলো প্রকাশনার এই অংশে–

মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী থেকে

বরিশাল রণাঙ্গন
(অরুণ বসু)
পথ চলছি। গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ। বাংলাদেশের পথ। আমি বাংলাদেশের মুক্তিফৌজ। আমার হাতে অস্ত্র, পাক হানাদার বর্বরবাহিনী নিধনযজ্ঞে এ অস্ত্র আমাকে সাহায্য করে।

Dhaka University Institutional Repository

কিছুক্ষণ আগেও আমার হাতের অস্ত্র কাজ করেছে। আমি এখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে। তবু পথ চলতে হবে। আমাকে এগিয়ে যেতে হবে আমার লক্ষ্যে। কিন্তু পা যে আর চলছে না। সমস্ত শরীরটা ক্লান্তিতে ভেঙ্গে যেতে চাইছে। দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হল না। পথের পাশেই একটা স্থান করে বসে পড়লাম। হাতের অস্ত্রটা একপাশে রেখে মাটির বুকে এলিয়ে দিলাম দেহটা। জোছনা রাত। রাত গভীর। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। আধো অন্ধকার আধো আলোয় দূরের গাছগুলোকে মনে হচ্ছে যেন নিষ্পেষিত এক একটি নীরব সাক্ষী। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুম জড়িয়ে ধরলো আমার দুচোখে। ঘুমিয়ে পড়লাম আমি। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে গেল কান্নার শব্দে। ধরফর করে উঠে দাঁড়ালাম। পাশে রাখা অস্ত্রটা হাতে তুলে নিলাম। অল্প দূর থেকেই মনে হল কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। শব্দ লক্ষ্য করে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। কয়েক পা এগুতেই অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তিকে এদিকেই এগিয়ে আসতে দেখলাম। দাঁড়িয়ে পড়লাম। অস্ত্রধরা হাতদুটো কঠিন হয়ে উঠলো। ছায়ামূর্তিটা এলো। অস্ত্রধরা হাত শিথিল হল। ভালো করে তাকালাম নারীমূর্তির দিকে। বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে হবে হয়তো। আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন নারীমূর্তি। হঠাৎ আমার পা'র উপর লুটিয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠলেন নারীমূর্তি, ওরা আমার ছেলেকে গুলি করে মেরেছে- আমার স্বামীকে হত্যা করেছে- আমি বেঁচে থেকে আর কী করব, আমায় তুমি শেষ কর- আমায় তুমি শেষ কর – বলতে বলতে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন মহিলা। সহসা কোন সান্ত্বনা দিতে পারলাম না। শুধু কঠিন ইস্পাতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম বোবা হয়ে। তখনো সে সমানে বলে চলছেন, বলো, বলো, তুমি আমাকে শেষ করবে? আর চুপ থাকতে পারলাম না এই কঠিন জিজ্ঞাসার কাছে। পা'র উপর থেকে তুলে দিলাম মহিলাকে। বললাম, দুঃখ করোনা মা। যারা তোমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে তাদের শাস্তি পেতেই হবে। কেঁদোনা মা। আশীর্বাদ করো তাদের। যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরণ লড়বার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঘর ছেড়েছে। তোমার ছেলে মেয়ে স্বামীকে তারা এনে দিতে পারবেনা কিন্তু তোমার দেশের বুক থেকে হানাদার শত্রুবাহিনী সমূলে উচ্ছেদ করবেই। মহিলার কান্না থামলো। কিছু যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। শুধু হাত দু'টো আমার মাথার উপর রাখলেন। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। মহিলার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জোরে পা ফেলে এগুতে লাগলাম সামনের দিকে। আর অপেক্ষা নয়। আর বিশ্রাম নয়। এগিয়ে যেতে হবে আমাকে। সাড়ে সাতকোটি বাঙালী তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। আমাকে এগুতেই হবে।

রাত শেষ হয়ে আসছে। পুব আকাশে ভোরের সূর্য লাল হয়ে উঠছে। আজকের সূর্যকে মনে হচ্ছে যেন বড় বেশি লাল। জানিনা আজ কত পশ্চিমা মায়ের কোল শূন্য হবে। জানিনা আজ কত নরপিশাচের রক্তে রঞ্জিত হবে বাংলার মাটি। কত রক্তে তৃপ্ত হবেন আমার বাংলা মা। [৫]

বিপ্লবী বাংলাদেশ ॥ ১: ২ ॥ ২১ আগস্ট ১৯৭১

[৫] হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃষ্ঠা - ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযোদ্ধার জীবনলিপি

এস এম ইকবাল

(টাঙ্গাইল থেকে)

এখন আমরা দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছি। কেননা এইমাত্র সংবাদ পেলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের উপর বিমান হামলা হচ্ছে। বিমান হামলার কারণ গত কয়েকদিন ধরে শত্রুসৈন্যরা এখানে এসে প্রচণ্ড মার খেয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন ধরে উপর্যুপরি আঘাত হেনেও পাক হানাদাররা আমাদের এতটুকু প্রতিহত করতে পারেনি। বরং গত পনেরো দিনের যুদ্ধে প্রায় চারশত খানসেনা ধ্বংস হয়েছে এখানে। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমাদের দখলে এসেছে। প্রচণ্ড মারের চোটে প্রতিবারই ওরা প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। টাঙ্গাইলের বিস্তীর্ণ এলাকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে। এইতো সেদিন বিদেশী কয়েকজন সাংবাদিক এসেও এর সত্যতা প্রমাণ করে গেছেন। হঠাৎ র‍্যাডার সংকেত দিতে শুরু করলো। বুঝলাম হানাদাররা আসছে। সাইরেন বাজল। সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ট্রেঞ্চের মধ্যে অস্ত্র নিয়ে অধির আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বিষদাঁত নিয়ে এগিয়ে আসছে বর্বর দস্যুরা। ওদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে। প্রতিহিংসার প্রতিশোধ নিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে খান সেনাদেরকে যে ওদের প্রতিহিংসার থেকেও আমাদের প্রতিশোধ কত কঠিন। আর ভাববার সময় পেলাম না। দুটো ফাইটার এরই মধ্যে মাথার উপর চক্কর দিতে শুরু করলো। হাতের এল-এম-জিটা শক্ত করে ধরে নিলাম। নির্দেশ ছিল, বোমাবর্ষণ করতে হলেই বিমানকে ছো মেরে নীচে নেমে আসতে হয় আর ঠিক তখনই তার উপর যদি গুলি লাগানো যায় তাহলেই বিমান পড়ে যেতে বাধ্য। দেখলাম সামনের বিমানটা ছো মেরে নীচে নেমে এলো। হাতের এল-এম-জিটা গর্জন করে উঠলো। কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হল। অদূরেই বোমাবর্ষণ হল। দেখলাম বোমার আঘাতে পাহারের একটা চূড়া সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। ভাগ্যিস ওখানে আমাদের মুক্তিসেনারা কেউ ছিলনা। আবার নেমে এলো একটা বিমান। হাতের মেশিনগানটা আবার গর্জন করে উঠলো। সাথে সাথে আরও অনেকগুলো শব্দ। বুঝলাম অন্যান্য বন্ধুদের হাতের অস্ত্রও এবার গর্জন করে উঠলো। মুহূর্ত মাত্র। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ততক্ষণে বিমানে আগুন ধরে গেছে। এবারে লক্ষ্য আর ব্যর্থ হয়নি। আনন্দের আতিশয্যে সামরিক নিয়ম লঙ্ঘন করে ট্রেঞ্চ থেকে উঠে পড়লাম। দেখলাম প্রজ্বলিত বিমানটা একটা বিকট শব্দ করে অদূরের ঘাঁটির সম্মুখে পড়লো। ছুটলাম সেদিকে সবাই। ততক্ষণে অন্য বিমানটা পালিয়েছে। ছুটতে ছুটতে দেখলাম, প্রজ্বলিত বিমানের আলোয় আমাদের ঘাঁটির স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার মাঝে স্বর্ণালী বর্ণের ম্যাপটায় যেন বিদ্যুত খেলছে। দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই মুহূর্তে আমার মনে হল বাংলা মা যেন আশীর্বাদ করছে তার সন্তানদের।[৬]

বিপ্লবী বাংলাদেশ ॥ ১: ৬ ॥ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

[৬] হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃষ্ঠা - ৬২-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত মা-বাবাকে মৃত্যুসংবাদ দিয়োনা

– শহীদ কাসেম
(দাবানলের প্রতিনিধ)

শটিবাড়ী। একটি গ্রাম। গ্রাম শুধু নয়। একটি মুক্তাঞ্চল। মুক্তিবাহিনী অসম সাহসে লড়াই করে মুক্ত করেছেন। এই শটিবাড়ীতে উড়িয়ে দিয়েছেন স্বাধীন বাংলার পতাকা। গ্রামের পাশ দিয়ে বসে গেছে ছোট্ট একটি নদী নাম তার তিস্তা। তিস্তা পার হয়ে দু'পা এগিয়ে যান। আপনি পৌঁছে যাবেন পাটগ্রাম। পাটগ্রামের আকাশে অনেকদিন থেকেই উড়ছে স্বাধীন বাংলার তেরঙ্গা পতাকা। এই পাটগ্রামের দখল ছিনিয়ে নেবার জন্য বেশ কিছুদিন ধরেই পাকবাহিনী চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু সেখানে স্বাধীন বাংলার ভিত্তি অত্যন্ত সুদৃঢ়। হাজার হাজার মুক্তিসেনা সেখানে তীক্ষ্ণ পাহাড়ায় রত। মুক্তাঞ্চলের সম্মান রক্ষায় সদা জাগ্রত। বহুবার বহু সংঘর্ষ হয়েছে। পাকবাহিনী পেয়েছে দাঁতভাঙ্গা জবাব। ব্যর্থ মনোরথে তাই জঙ্গিশাহী নানা বর্বর কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়ে শটিবাড়ীর জনগণের উপর। রাইফেল আর কামানের মুহুর্মুহু গর্জনে সেখানের আকাশ বাতাস হয় মুখরিত। পাক বাহিনীর সাথে যোগ দেয় গ্রামবাংলার কুসন্তান রাজাকারের দল। এই শয়তারনাই শুরু করে লুটপাট আর অগ্নিসংযোগ। উদ্দেশ্য প্রভুদের তুষ্ট করা। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সেখানকার জনগণ খবর দেয় পাটগ্রামে। পাটগ্রাম মুক্তিযোদ্ধাদের অত্যন্ত সুদৃঢ় ঘাঁটি। খবর পেয়েই মুক্তিসেনার দল নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসেন। প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে নিয়ে তারা শটিবাড়ীর দিকে এগিয়ে যান। প্রায় ৬৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার ক্যাপ্টেন মতিয়ার রহমান একদিন রাতে নৌকাযোগে তিস্তা নদী দিয়ে এগোতে শুরু করেন। শটিবাড়ীর ওইদিনের কথা বলতে গেলে ক্যাপ্টেন মতিয়ার রহমানের কথা কিছুটা না বলে পারা যায় না। ওই এলাকায় যতগুলো সংঘর্ষ হয়েছে সবগুলোতেই তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। তাকে প্রথম সারিতে পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা আরও দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে গেছেন একের পর এক সংঘর্ষে। ২৫ শে মার্চ পাকবাহিনীর বর্বর অত্যাচার শুরু হবার পরপরই মতিয়ার রহমান অত্যন্ত কৌশলে পাক হানাদারের চোখে ধুলো দিয়ে যোগ দিয়েছিলেন এই মুক্তিবাহিনীতে। তারপর অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়েও তিনি সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন তার বাহিনীকে। নদী পার হয়ে দলের একটি অংশ কয়েকটা গ্র্যানেড হাতে নিয়ে এগিয়ে যায় শটিবাড়ীর দিকে। উদ্দেশ্য সমগ্র পরিস্থিতিটা যাচাই করে নেয়া। এদিকে শটিবাড়ীর হাটে রাজাকার ও পাকবাহিনীর লোকেরা তখন ফন্দিফিকির আঁটছিল। মুক্তিবাহিনী বেশ কয়েকটি উপদলে ভাগ হয়ে সমস্ত শটিবাড়ীজুড়ে ছড়িয়ে পড়লো। অল্প সময়ের মধ্যেই মুক্তিবাহিনী শত্রুদেরকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেললো। রাজাকারবাহিনী মুক্তিবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পার্শ্ববর্তী বাংকারের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বাংকারে ঢুকেই শত্রুসেনারা গুলি ছুড়তে শুরু করে। এদিকে মুক্তিসেনারাও চারদিকে থেকেই গুলি ছুড়তে শুরু করেন। তাদের কামান আর রাইফেলের গর্জনে রাজাকারদের রাইফেল স্তব্ধ হয়ে যায়। একটি ছেলে তখন গ্র্যানেড হাতে বাংকারের দিকে এগিয়ে যায়। আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রথমে সে রাজাকারদের অনুরোধ জানায়। কিন্তু তারা তা অগ্রাহ্য করে রাইফেল উঁচু করতেই ছেলেটি গ্র্যানেড ছুড়ে মারে। একের পর এক গ্র্যানেড ছুড়ে ১৪ জন রাজাকারকে খতম করা হয়। অবশিষ্ট ভীত রাজাকাররা তখন সুরসুর করে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করে। এরমধ্যে একজন পালাতে চেষ্টা করলে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়া হয়। এই সংঘর্ষে মুক্তিবাহিনী মোট ১২টি রাইফেল উদ্ধার করে। অপারেশন শেষ করে ফেরবার পথে একটি দুর্ঘটণা ঘটে। মুক্তিবাহিনীর পেছনে কমান্ডো পার্টির কভার ফায়ারের সময় একটি গুলি একটি গাছে লেগে দিক পরিবর্তন করে। গুলিটি গিয়ে পড়ে মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেমের উপর। আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়। আহত ও হস্তগত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাটগ্রামে পৌঁছেই আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আঠারো বছর বয়স্ক স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থী কাসেমকে আর বাঁচানো গেল না। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আবুল কাসেম বলল, স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত আমার মৃত্যুসংবাদ আমার মা বাবাকে জানিওনা। আবুল

কাসেম আজ শুধুমাত্র একজন মুক্তিযোদ্ধা নয়। সে আজ প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার কাছে এক বিরাট আদর্শ। মুক্তিযোদ্ধা একটি মাত্র শব্দকে ভালোবাসে তা হল স্বাধীনতা। কাসেমের মৃত্যু ব্যর্থ হবার নয়। কাসেম আজ হাজার হাজার ছেলের প্রেরণা। কাসেমের আদর্শে দিক্ষীত হয়ে হাজার হাজার দামাল ছেলে আত্মোৎসর্গের মিছিলে সামিল হচ্ছে। কাসেমের শবদেহ যখন পাটগ্রাম স্কুল প্রাঙ্গণে নিয়ে আসে, স্কুলপ্রাঙ্গণ তখন লোকে লোকারণ্য। হাজার হাজার নরনারী জমায়েত হয়েছেন বীরের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। বীরের মর্যাদাস্বরূপ প্রদান করা হল গার্ড অব অনার। শহীদ কাসেমের নামে পাটগ্রাম ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের নাম রাখা হল শহীদ কাসেম ফ্রি প্রাইমারী স্কুল। শবদেহ নিয়ে যখন শোভাযাত্রা মসজিদের দিকে এগোচ্ছিল তখন একটিমাত্র কথাই শোনা গিয়েছিল। মরতেই যদি হল তাহলে শহীদ কাসেমের মতো মরব। বীরের মতো মরব। শহীদ কাসেমের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে গোটা বাঙালী জাতির অন্তরের মূল সুর। মুখ বুজে আমরা আর অত্যাচার সহ্য করব না। আমরা লড়বো আমরা মরবো কিন্তু মেরে মরবো দেশকে শত্রুর কবল মুক্ত করবো, স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবোই। [৭]

দাবানল ॥ ১: ৪ ॥ ৩১ অক্টোবর ১৯৭১

শহীদস্মরণে

মল্লিকবাড়ীর নতুন নাম মান্নান নগর

২০ শে নভেম্বর। আজ ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাংলার কৃতীসন্তান মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক আফসার উদ্দীন আহমেদ মল্লিক বাড়ীর এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি এ দিনটিকে খুশির দিন হিসেবে গ্রহণ না করে বাংলা থেকে শত্রুদের নির্মূল করার শপথ নেবার জন্যে জনগণের কাছে আকুল আবেদন জানান। এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শহীদদের স্মরণ করে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। পরিশেষে তিনি এতদঞ্চলীয় মুক্তিবাহিনী গঠনে বিশেষ উদ্যোক্তা এই মল্লিকবাড়ীর বীর সন্তান এবং রণাঙ্গনে ভালুকা থানার প্রথম শহীদ আব্দুল মান্নানকে স্মরণ করে আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, আজ থেকে শহীদ আব্দুল মান্নানকে স্মরণ রাখার জন্যে মল্লিক বাড়ীর নতুন নাম রাখা হল মান্নান নগর। তার এ প্রস্তাবটিকে জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি দিয়ে সমর্থন জানায়।[৮]

জাগ্রত বাংলা ॥ ১: ৭ ॥ ২৮ নভেম্বর ১৯৭১

[৭] হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃষ্ঠা - ৭৪-৭৫

[৮] হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃষ্ঠা - ৮৩-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

গেরিলার ডায়েরী

মুকুল নায়ক

আমি একজন গেরিলা নায়ক। গতমাসে পাবনার বিভিন্ন মুক্ত এলাকা ঘুরেছি। গ্রাম বাংলার মানুষ এতো দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতনের মাঝেও সুকঠিন মনোবল নিয়ে থাকতে পারে এটা একটা বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত ছাড়া কিছুই নয়। তাদের বাড়ীঘর দস্যুসেনারা জ্বালিয়েছে, লুট করেছে মা বোনের ইজ্জত, হত্যা করেছে নিরীহ মানুষকে, তবুও তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মুক্তিবাহিনীর আগমনের অপেক্ষায়। বাংলার কোটি মানুষ আজ খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান ও ঔষধের অভাবে তীলে তীলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তবুও তারা দেশকে শত্রুকবল মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প থেকে পিছপা হননি। তারা দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তারা যে নিরস্ত্র। তাদের সকলের কথা – অস্ত্র চাই, মরতে হয় যুদ্ধ করে মরবো– দেশকে স্বাধীন করবই। কথা বলার সময় মনে হচ্ছিল তাদের চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছে। সত্যি যদি তাদেরকে অস্ত্রে সজ্জিত করা হত তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রাম ত্বরান্বিত হত। রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন রণাঙ্গণ থেকে এলো আমাদের গেরিলা ইউনিটসমূহের দলপতিগণ। এক এক করে তাদের কাজের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। দলপতি ইকবাল ইতিমধ্যে এক হাজার যুবককে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং দিয়েছে। গাজনার বিলে অপারেশন করে এগারোজন দুর্ধর্ষ ডাকাতকে ধরে এনে গণ আদালতে বিচার করে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। বাকি দুষ্কৃতিকারীগণ গ্রাম থেকে পালিয়েছে ফলে সেই এলাকা শত্রুমুক্ত হয়েছে। দলপতি জাহাঙ্গীর ছয়শত যুবককে ট্রেনিং দিয়েছেন। তারা পাবনার ভাদুরে ভাংগা চরে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে চারজন পাক সেনাকে খতম করে ২৮জন রাজাকারকে ধরে এনেছে। তাদেরকে গণ আদালতে বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। তৃতীয় দল নগরবাড়ীগামি পাকসেনা বোঝাই ট্রাকের উপর আক্রমণ চালিয়ে ১২জন পাক সেনাকে খতম করেছে। তাদের বীরত্বপূর্ণ কাজের কথা শুনে সত্যিই আনন্দ অনুভব করছিলাম। তারপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলাপ সেরে রাতের অন্ধকারে তারা ঘাঁটিতে ফিরে গেল। আমিও চললাম – গন্তব্য স্থানে।[৯]

দাবানল ॥ ১: ৪ ॥ ৩১ অক্টোবর ১৯৭১

মুক্তিযোদ্ধার ডায়েরী

- নজরুল ইসলাম

উজিরপুর থেকে, ১৭ নভেম্বর ১৯৭১।

মা,

অনেকদিন পর তোমায় লিখছি। মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প থেকে। জানিনা আমার এ লেখা তোমার হাতে গিয়ে পৌছবে কি না। তোমার হাতে না পৌছলেও বাংলার অনেক মায়ের কাছেই আমার এ লেখাটুকু পৌছবে। তাদের কাছ থেকে তুমি জেনে নিও মা। জানি তুমি প্রত্যেক মুহূর্তেই ভাবছো আমাদের কথা। হয়তো ভাবছো কোথায় আছি, কী অবস্থায় কেমন আছি। আমি কিন্তু খুব ভালো আছি মা। আমি তো আমার কথা মোটেই ভাবি না। আমার ভাবনা হয় তোমার জন্য। কারণ নরঘাতক ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর মধ্যে তুমি ভয়ভীতির মধ্য দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত কাটাচ্ছো। জানি, তোমার তিন ছেলের বড় দুটিই তোমার কোল ছেড়েছে। এজন্য হয়তো তুমি খুব ভাবছো। হয়তো সবার অগোচরে চোখের জল ফেলছো। তাই না মা? দুঃখ করোনা। একবার ভেবে দেখো, রতন, টেলু, খোকন, বন্ধু মন্টু, অমূল্য, খোরশেদ ওদের কথা। ওরাও তো আমারই মত মায়ের কোল ছাড়া। ওদের মায়ের সাথে তুমিও তোমার ভাগ্যকে মিলিয়ে নিও। মা, তোমাকে রক্ষা করতেই তো তোমাকে ছেড়েছি। দীর্ঘ চব্বিশটি বছর ধরেই তো বাংলার মায়েরা, বোনেরা লাঞ্ছিতা। যদি তোমার এই হতভাগা ছেলেটি তার প্রাণের বিনিময়েও

[৯] হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃষ্ঠা - ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার মা বোনদের দুঃখ কিছুটা লাঘব করতে সহায়তা করতে পারে তবেই না তোমার গৌরব। জান মা, আজ বারবার মনে পড়ে আব্বার সেই কথা, "নো রিস্ক নো গেইন"। দেশ ও জাতির এরকম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করতে হলে তোমাকে রিস্ক নিতেই হবে। আব্বার এ কথা মনে হলে আমার মনে যে কতটুকু সাহস হয় তা তুমি জানো না। মা, পবিত্র রমজান মাস তো শেষ হয়েছে। ঈদ এসেছে। আচ্ছা মা তুমি কি বলতে পারো প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কি আনন্দের বার্তা নিয়ে ঈদ এসেছে? তাই যদি হবে তাহলে আজকের দিনে কেন বাংলার ঘরে ঘরে শুনতে পাই কান্নার রোল? আমার বাংলা মা আজ কেন এতো কাঁদছে? জানি মা এ দিনেও তোমার মনেও অনেক ব্যাথা লাগছে। ঈদের আনন্দ কারোরই হবে না। সেই ভালো। যে দেশের মা বোনেরা মান ইজ্জতের ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে দিকে দিকে। যে দেশে লাখো লাখো গরীব, অসহায়, নিরাশ্রয় মানুষ মরছে অকাতরে, যে দেশের মানুষ মাথা গোঁজবার স্থানটুকুও হারিয়েছে, যে দেশের ভাইয়েরা প্রতিমুহূর্তে শত্রুর সাথে পাঞ্জা লড়ে যাচ্ছে সে দেশে আনন্দ কিসের? কাদের জন্য এসেছে এ আনন্দের দিন? আজ কোনও আনন্দ নয় মা। আজ প্রতিজ্ঞা নেবার দিন। আজকের দিনে এই প্রতিজ্ঞাই আমাদের নিতে হবে যে, ঈদের আনন্দ আমরা করব তবে তা পরাধীন দেশে নয়। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে। এই দিনে তুমিও এই দোয়াই করো মা, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে যেন তোমার কোলে ফিরে আসতে পারি। আর সেই শুভদিনের আগেই যদি আমি হারিয়ে যাই, যদি আমাকেও বিদায় নিতে হয় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে, তাহলে দুঃখ করোনা মা। রতন, টেলু, খোকন, মন্টু এবং আরও বাঙালি ভাইদের দিকে তাকিয়ে দেখ। তাদের মাঝেই খুঁজে পাবে আমায়।
রাণী, রুনীকে ফজলুর কাছে অস্ত্র চালনা শিখে নিতে বলবে। তুমিও শিখে নিও। নান্নু ওর কাজ ঠিকমতোই করছে। ওর জন্য ভেবোনা। ও ভালো আছে। আমাদের জন্য চাই তোমার দোয়া।
ইতি-[১০]

বিপ্লবী বাংলাদেশ ॥ ১: ১৪ ॥ ২১ নভেম্বর ১৯৭১

এই রকম বহু অভিজ্ঞতার সামান্যতম অংশই উঠে এসেছে বিক্ষিপ্তভাবে তৎকালীন মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর পাতায়। সামগ্রিক দৃশ্যপটের তুলনায় প্রচারের মাত্রাটা ব্যাপকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে অপ্রতুল হলেও সাধারণের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের 'ইমেজ' সৃষ্টির যে প্রয়াস এ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় তার প্রভাব ছিল দুর্দমনীয়। একজন মুক্তিযোদ্ধার রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা কিংবা আবেগ উৎসারিত নানা ঘটনাক্রমের মধ্যেই একজন শরণার্থী শিবিরের শরণার্থী কিংবা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খুব সাধারণ একজন মানুষ খুঁজে পেতেন তার স্বীয় সত্তাকে। আর তার মাধ্যমেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের বিষয়টি লাভ করেছিল একটা সর্বজনীন রূপ। যার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় সমগ্র দেশের গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেয়া সাহসী যোদ্ধাদের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতায়। তবে

[১০] হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃষ্ঠা - ৮২-৮৩

Dhaka University Institutional Repository

শুধু প্রচারিত সংবাদের জোরেই নয়, বরং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি দেশপ্রেম আর দেশাত্মবোধ থেকে সৃষ্ট হৃদয় উৎসারিত আবেগের জন্যও এক ধরনের সমর্থনবোধ কাজ করেছিল তা অনস্বীকার্য। যে কারণে এক্ষেত্রে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর খবরগুলোর প্রভাবকে একেবারে যুগান্তকারী দাবি করা না গেলেও তার বেশ প্রভাব যে ছিল তা অস্বীকার করা চলে না।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এবং মুক্তাঞ্চলের পত্রপত্রিকা

১৯৭১ সালের পাকিস্তানের দুই ভুখণ্ডের মধ্যে জাতিসত্তার যে তীব্র দ্বন্দ্ব তা যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রের সম্মুখ লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং সেই যুদ্ধের সীমা সময়ের সাথে ছড়িয়ে পড়ে পুরো বিশ্বে। বিশ্বের সামনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ওপর অমানবিক নির্যাতন ও নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালানো হয়। বিশ্বজনমত সৃষ্টির প্রয়াস নেয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব জনতার সামনে এই যুদ্ধের প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরার মাধ্যমে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সরকারের নৃশংস চিত্রটি জনসম্মুখে উপস্থাপন করা ও দেশটির পূর্বভাগের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের প্রতি সহমর্মী করে তোলা।

এই উদ্দেশ্যটি হাসিলের বেশ কয়েকটি পন্থাই নজরে আসে ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা করলে। প্রথমত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পেশার প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিজস্ব উদ্যোগে নিজ দেশের প্রতি মমত্ববোধ থেকে বাংলাদেশে চলমান তৎকালীন বর্বরতা ও নৃশংসতার চিত্র তুলে ধরেছেন নানাভাবে। শুধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মানুষের জন্য অর্থসাহায্যই নয়, তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো পরদেশে নিজ দেশের দুর্ভাগ্যের বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে। একই ধরনের তৎপরতা লক্ষ্য করা করা গেছে কিছু দেশে নিযুক্ত কূটনৈতিক মহলেও। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানি দূতাবাসে যেসব বাঙালি কূটনীতিক কর্মরত ছিলেন, তাদের মধ্যে প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে যুদ্ধরত বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান গ্রহণের। তাদের উদ্যোগের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপ ছিল স্বপক্ষ ত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশি হিসেবে একটি নতুন পরিচয়ে আবির্ভূত হওয়ার অভিপ্রায়। তার পাশাপাশি ওইসব কূটনীতিক বাংলাদেশে চলমান যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে তরান্বিত করতে সহায়তা দান করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের বর্বরোচিত নিপীড়ন ও শরণার্থী শিবিরগুলোতে আশ্রয়প্রার্থী হতভাগা বাংলাদেশিদের দুর্দশার করুণ চিত্র প্রত্যক্ষ করেন ভারতের প্রখ্যাত সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশংকর। বাস্তবতার এই করুণ চিত্র নাড়া দেয় তার বিবেককে। কিছু করার প্রয়াস থেকে তিনি বিষয়টি নিয়ে কথা

বলেন তার বন্ধু ও সঙ্গীত সহযোদ্ধা আমেরিকার বিটলস ব্যান্ডের সদস্য ও কণ্ঠশিল্পী জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে। মাত্র কয়েকদিনের প্রস্তুতিতে তাদের দুজনের সঙ্গে যোগ দেন এরিক ক্ল্যাপ্টন, বব ডিলান, বিলি প্রেস্টন ও লিয়ন রাসেলের মতো তৎকালীন রক সঙ্গীতের আরও কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি। যার ফলে ১৯৭১ সালের ১ মে আমেরিকার ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক সঙ্গীত সন্ধ্যা 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। সেই কনসার্টটি গানের মাধ্যমে দুর্দশাগ্রস্ত বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরে বিশ্ববাসীর কাছে। পাশাপাশি সেই কনসার্টলব্ধ অর্থও প্রেরণ করা হয় শরণার্থী শিবিরের তহবিলে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির প্রসঙ্গে বিশ্বজনমত গঠনে জর্জ হ্যারিসন - রবি শংকর ও তাদের সতীর্থদের এই প্রয়াস সারা বিশ্বে আলোড়িত হয়েছিল সেই সময়।

বিশ্বজনমত গঠনের এই প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা গণমাধ্যমের কল্যাণেই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেক্ষাপটের বাস্তব চিত্র পৌঁছে যায় বিশ্বজনতার সামনে। গণমাধ্যমের ভূমিকা বর্ণিত করতে গেলে প্রথমেই চলে আসে বিদেশি সংবাদমাধ্যম ও তাদের প্রেরিত সংবাদ সংগ্রাহকদের কথা। বিদেশি সাহসী সাংবাদিকগণ অকুস্থল থেকে যেমন খবর সংগ্রহ করতেন, আবার স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছ থেকেও সংবাদ সংগ্রহ করতেন। এই বিষয়ে বাংলাদেশের রৌমারী মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক অগ্রদূত পত্রিকার সম্পাদক আজিজুল হক বলেন, 'সায়মন ড্রিং, এন্থনি মাসকারেনহাস, এলেন গিন্সবার্গ একটা টিম হিসেবে আমার ওখানে গিয়েছিল'।[১] মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশে এসে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে যাওয়া সাংবাদিকদের মাঝে ছিলেন বার্নার্ড হেনরী লেভীর মতো খ্যাতিমান সাংবাদিকও। তবে বিশ্বের হাতেগোনা কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের পক্ষেই শুধু সম্ভব ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল এই প্রক্রিয়াটি সমাধা করা। তদুপরি যুদ্ধসংকুল একটি জনপদে সংবাদ সংগ্রহের জন্য আসার মতো সাহসী পদক্ষেপও ছিল বেশ দুরূহ একটি বিষয়। সেসব দিক বিচারে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর তথ্যও অনেক ক্ষেত্রে খোড়াক হয়েছে বিশ্ব সংবাদমাধ্যমগুলোর।

তবে এক্ষেত্রে বিশ্বজনমত গঠনের বিষয়টিতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকা আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রথমত, বিদেশি

[১] আজিজুল হক, সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদমাধ্যমের তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের যুদ্ধপরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরার শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পক্ষে তাদের অবস্থান ও নানা রকম কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের সংবাদ উপস্থাপন করে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বাড়িয়ে তোলার মাধ্যমেও মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আলোচ্য পত্রপত্রিকাগুলোর অবস্থান নিম্নে আলোচিত হল।

বিশ্বজনমত গঠনে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর তথ্যসূত্র হিসেবে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা

পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সরকার অধিকৃত বাংলাদেশের বড় সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রকাশিত সংবাদ সর্বক্ষেত্রেই হারিয়েছিল বস্তুনিষ্ঠতা। পাকিস্তানি সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকারের চাপের মুখে তারা দিনে দিনে পরিণত হয়েছিল পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সরকারের মুখপত্র। আর সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সার্বিক যুদ্ধপরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহে একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে উঠেছিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো। সরাসরি সেসব পত্রপত্রিকা তাদের প্রকাশিত সংবাদ কিংবা সংবাদ পরিক্রমার মাধ্যমে বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করেছিল এমন দাবি করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ হাতেগোনা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এই পত্রপত্রিকাগুলোর বেশিরভাগেরই ভাষাগত মাধ্যম ছিল বাংলা। যা কিনা সরাসরি কোনো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম কিংবা কোনো ভিনদেশি নাগরিকের কাছে একাধারে ছিল অপঠনযোগ্য। অন্যদিকে বাংলাদেশের বাইরে ভারত ব্যতীত অন্য যেকোনো দেশে ওইসব পত্রিকা সহজলভ্য ছিল না। কিন্তু পরোক্ষ প্রভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদমাধ্যমগুলোর হস্তক্ষেপে এই পত্রপত্রিকাগুলোর প্রকাশিত সংবাদের তথ্য গৃহীত হয়েছিল বিশ্বের অনেক বড় বড় সংবাদমাধ্যমের তথ্যসূত্র হিসেবে। এ তথ্যের প্রমাণ মেলে রৌমারী মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক অগ্রদূত পত্রিকার সম্পাদক আজিজুল হকের সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের জবাবে,

> কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে সাংবাদিক সুমন্ত সেন এসেছিলেন। দেখা করে গেছেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডির ভাই রবার্ট কেনেডি রৌমারী সফর করে গেছেন। পত্রিকা সমেত আমার ছবি উঠিয়েছেন। এটা ওদের এনবিসিতে প্রচার হয়েছে।

> আমাদের ওখানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ইনচার্জ ছিলেন তার নাম ছিল লে. কর্নেল নুরুন্নবী সাহেব। উনি একবার লন্ডনে বিবিসি হাউসে গিয়েছিলেন। ওখানে গিয়ে দেখেন আমার স্কুল গ্রাউন্ডের মুক্তিযোদ্ধাদের প্যারেডের ছবি, আমাদের পত্রিকার ছবি বিবিসি হাউসের দেয়ালে টাঙানো। উনি দেখে হতবাক! পরে তিনি জানতে পারেন, যেসব দেশে এই ধরনের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়, সেসব দেশের এসব দুর্লভ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিবিসি অনেকদিন সংগ্রহ করে রাখে। ওখানে আমার পত্রিকাও সংগ্রহ করা আছে।[২]

একই তথ্যের সন্ধান মেলে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত জয় বাংলা পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক ও মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবিবের সাক্ষাৎকারেও। হারুন হাবিব বিশ্বজনমত গঠনে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে বলেন,

> *দি পিপল* নামে বাংলাদেশের একটা ইংরেজী পত্রিকা ভারত থেকে বেরুতো। আর বাকি সবগুলোই কিন্তু বের হতো বাংলায়। একটা বড় জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, এই কাগজগুলো শুধু যে আমাদের দেশের মধ্যেই দেয়া হয়, কিংবা রিফিউজি বা মুক্তিযোদ্ধারা পড়তো, অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষরা পড়তো, তা না। এগুলো কিন্তু বিদেশিদের আকৃষ্ট করেছে। আমি যখন রৌমারীতে ছিলাম, এনবিসি টেলিভিশন টিম আসলো। মুক্তিযুদ্ধের উপর তথ্যচিত্র করার জন্য। তখন কাদের সিদ্দিকীও ওখানে ছিলেন কিছুদিনের জন্যে। তারও পোর্টফোলিও করলো তারা। তারা যদিও বাংলা পড়া জানতো না, তাদের সঙ্গে দোভাষীও ছিল। আমাদের অনেক কাগজ তারা নিয়ে গেলো। এরকম রণাঙ্গন থেকে যে কাগজগুলো বের হতো তার বেশিরভাগই, সবগুলো হয়তো পারেনি, তারা সংগ্রহ করে নিয়ে গেলো। আর এগুলো থেকে তারা, আমাদের একটি যোদ্ধা জাতি

[২] আজিজুল হক, সাক্ষাৎকার।

> হিসেবে উপস্থাপন করে মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি কি অবস্থায় আছে তার প্রতিবেদন করতো। এধরনের কাগজগুলো নিশ্চয়ই বহির্বিশ্বেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে।[৩]

এ বিষয়ে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার জন্যে খানিকটা দ্বিমত পোষণ করেন সাপ্তাহিক স্বাধীনতা পত্রিকার সম্পাদক অরুণাভ সরকার। এ প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে অরুণাভ সরকার বলেন,

> আমার মনে হয়না ওই ব্যাপারে এসব পত্রিকাগুলো খুব একটা ভূমিকা রাখতে পেরেছিল। কারণ এই পত্রিকাগুলোর ভাষা ছিল বাংলা। বহির্বিশ্বে এগুলোর কোনও প্রভাব ছিল না। তবে পত্রিকাগুলো এই দেশের রাজনৈতিক নেতাদের উপর প্রভাব ফেলতো। এবং তারা হয়তো বহির্বিশ্বে, তথা ভারত থেকে শুরু করে আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন, জাপানসহ প্রভৃতি দেশে এসব সংবাদকে প্রচার করার জন্য উদ্যোগ নিতেন।[৪]

অর্থাৎ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর বিভিন্ন সংখ্যা বিদেশি সাংবাদিকরা সংগ্রহ করেছেন, কিছু পত্রিকার সম্পাদকের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করলে দেখা যায় পত্রপত্রিকাগুলো বিদেশি মিডিয়ার জন্য কিছু খবরাখবর সরবরাহ করলেও তারা নিজস্ব উৎসকেই প্রাধান্য দিত এবং 'যাচাই-বাছাই' করে বাংলাদেশ বিষয়ক খবর পরিবেশন করতো।

[৩] হারুন হাবীব, সাক্ষাৎকার।

[৪] অরুণাভ সরকার, সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিবেশনে পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা

আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে বাংলাদেশের যুদ্ধপরিস্থিতি বিষয়ক সংবাদ কিংবা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সংঘটিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিষয়ে সংবাদ উপস্থাপন করাও ছিল মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ১৯৭১ সালে তারা এই কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন। এসব সংবাদ ও তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বিশ্ববাসীর অভয়বার্তা ও সমর্থনের খবর পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মনোবল বৃদ্ধিতে এসব পত্রপত্রিকার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। নিম্নে এমন কিছু সংবাদের চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

ইংল্যান্ডে বাংলাদেশের সমর্থনে সভা

সম্প্রতি গ্রেট ব্রিটেনস্থ বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ইংল্যান্ডের কনওয়ে হলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক খন্দকার মোশাররফ হোসেন সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ সরকারের বৈদেশিক মুখপাত্র বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার রহমান সোবহান, লন্ডন থেকে প্রকাশিত বাংলা সাপ্তাহিক 'জনমত' এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব আনিস আহমদ ও 'একশন বাংলাদেশ' এর মুখপাত্র মিস্টার পল কনট এবং ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ওরালী আশরাফ।

এছাড়া 'বাংলাদেশ একশন কমিটি'র উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনের গ্র্যান্ড প্যালেস হলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব গওস খান, জনাব তৈয়বুর রহমান, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, জনাব জাকারিয়া খান চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বিচারপতি চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত তহবিলের প্রতি সবার সহযোগিতার জন্য আবেদন জানানো হয়।[১]

স্বদেশ ॥ ১: ১ ॥ ১৬ জুন ১৯৭১

বাংলাদেশের সমর্থনে সিংহল

বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগণকে সমর্থনের জন্য সিংহল সরকার জনমতের প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তিকামী জনসাধারণের জন্য সহানুভূতিশীল সরকারী নীতি নির্ধারণ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচারকে ধিক্কার দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক জনসমষ্টির সঙ্গে সারিবদ্ধ হওয়ার স্বপক্ষে সিংহলের জনমত ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে। যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকারের দুইটি সরকারী দল, ট্রটস্কী-পন্থী এবং মস্কোপন্থী কম্যুনিস্টগণ গণ্যমান্য নাগরিকদের দ্বারা গঠিত বাংলাদেশের জনগণের মানবাধিকার রক্ষা সমিতিতে যোগদান করেছেন, শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির অধিকাংশ সদস্যও উক্ত সমিতিতে যোগদান করবেন। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের দুটি সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিতগণ এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য গণত্রাণ ভাণ্ডারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।[২]

জয়বাংলা (১) ॥ ১: ১৬ ॥ ২৭ আগস্ট ১৯৭১

[১] হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃষ্ঠা-১৯৬

[২] হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃষ্ঠা-২০১

Dhaka University Institutional Repository

নূতন দিল্লিতে বাংলাদেশ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

রৌমারী ॥ ২১ সেপ্টেম্বর

আকাশবাণী প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে নূতন দিল্লিতে বাংলাদেশ প্রশ্নে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন তিনদিন যাবত চলে। সারা বিশ্বের মোট ২৫টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনে যোগ দেন। ভারতীয় প্রতিনিধি মিস্টার জয়প্রকাশ নারায়ণ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম পাকিস্তানি সমরনায়কদের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ও ভারতে অবস্থানরত বাঙালী শরণার্থীদের সমস্যাই এই সম্মেলনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় বলে বিবেচিত হয়। বিশ্বের ২৫টি দেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিকগণ নিম্নলিখিত মতামত প্রকাশ করেন:-

১) বাংলাদেশ সমস্যা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন ব্যাপার বলে কিছুতেই গৃহীত হতে পারে না।

২) অতিশীঘ্র বাংলার হত্যালীলা বন্ধ করার জন্য সকল দেশের উচিত পাক সামরিক সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা।

৩) পাক সরকারকে সকল প্রকার সামরিক সাহায্য অচিরেই বন্ধ করা উচিত।

৪) মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দ্বারা সাহায্য করা সকল দেশের উচিত।

৫) বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল দেশের এগিয়ে আসা উচিত।

৬) ভারতে অবস্থানরত বাঙালী শরণার্থীদের সাহায্য করা সকল দেশের মানবিক কর্তব্য

সংবাদে আরও প্রকাশ বাংলাদেশের গণহত্যার করুণ কাহিনী প্রচারের জন্য ও বিশ্বজনমত সংগ্রহের জন্য এই সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন করা হয়, তার সদর দপ্তর হবে লন্ডনে এবং কিছুসংখ্যক শাখা অফিস পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও থাকবে। সম্মেলনে যোগদানকারী ১০টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনের জন্য আসবেন ।[৩]

অগ্রদূত ॥ ১: ৪ ॥ ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১

বাংলাদেশের সমর্থনে সুইডেনে বিক্ষোভ

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের পাক দূতাবাসের সামনে তিন শতাধিক বিক্ষোভকারী গত ১২ই নভেম্বর রাত্রে বাংলাদেশের সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এএফপি পরিবেশিত সংবাদে জানা যায়, বিক্ষোভকারীরা পাকিস্তানকে সুইডেনের সাহায্যদান বন্ধ রাখার এবং পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি জানান। বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবার সময় বক্তারা 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সংঘটিত বিশ্বের জঘন্যতম বর্বরতা'র প্রতি সুইডিস সরকারের বিরূপ মনোভাবের প্রমাণ হিসেবে অবিলম্বে পাকিস্তানকে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে সুইডেন থেকে বহিষ্কারেরও দাবী জানান। 'ইয়াং লিবারাল অর্গানাইজেশন' এর সদস্যরা বিক্ষোভটির আয়োজন করেন।[৪]

দেশ বাংলা ॥ ১: ৪ ॥ ১৮ নভেম্বর ১৯৭১

[৩] হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃষ্ঠা-২০৭

[৪] হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃষ্ঠা-২২২

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বসংবাদপত্রের কণ্ঠস্বর

গ্রেট বৃটেন
দি টাইমস
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
"সৈন্যবাহিনী সারাগ্রামে যথেচ্ছভাবে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করলো। তারপর তারা রাজাকারদের পাঠিয়ে দিলো ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে। চোখের সামনে দেখলাম আমার চারবন্ধু গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। পরিবার নিয়ে দৌড়ে পালালাম নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। গ্রামের অন্যান্যদের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা আমি জানি না। পাক অধিকৃত এলাকা থেকে পালিয়ে আসা মিঃ মন্ডল তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিলেন। ৩৫ বৎসব বয়স্ক দুগ্ধ বিক্রেতা কনক ঘোষের বাড়ি ছিল খুলনা জেলার পাইকগাছা মহকুমায়। তিনি তিন দিন আগে সপরিবারে ভারতে পালিয়ে এসেছেন। তার গ্রামে প্রায় ২০০ হিন্দু পরিবার ছিল। তিনি বললেন, ৫ দিন আগে রাজাকার ও মুসলিম লীগের লোকেরা পাশের গ্রাম থেকে তাদের গ্রামে যায়। তারা সমস্ত ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয় ও দু'জন লোককে খুন করে। রাজাকাররা সাদা পোশাকেই ছিল এবং প্রত্যেকের কাছে রাইফেল ও রিভলবার ছিল। এরপর তিন দিনে অন্তত অর্ধেক গ্রামবাসী গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছেন।"

সানডে অবজারভার
৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
পশ্চিম পাকিস্তানের ঘটনাবলী দ্রুত এমন এক দুর্যোগের দিকে এগুচ্ছে, যা গত মার্চ মাসে সারা পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক শক্তি, পিপলস পার্টির নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো দাবী করেছেন যে 'ভাঁওতাবাজী'র আশ্রয় না নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উচিত অবিলম্বে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া, যিনি ব্যাপক জনসমর্থিত আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য সামরিক শক্তির ব্যবহার ছাড়া অন্য কিছু চিন্তাই করেননি, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষুদ্রতর পিপলস পার্টির মোকাবিলা করতে ভয় পাবেন বলে মনে হচ্ছে না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন
প্রাভদা
"পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের যেসব কাজের ফলে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ অসামরিক লোককে বাস্তুভিটা, জমি, সম্পত্তি ফেলে রেখে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে, সেসব কাজের কোনও যুক্তি নেই।"[৫]

সাপ্তাহিক বাংলা ॥ ১: ৩ ॥ ১০ অক্টোবর ১৯৭১

রাষ্ট্রসংঘে 'পাক–অপপ্রচার' ব্যর্থ হয়েছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)
মুজিবনগর ঃ রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ সভায় বাংলাদেশ সম্পর্কে পাক অপপ্রচার এবং এ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপের অভিযোগ রাষ্ট্রসংঘের অধিকাংশ প্রতিনিধিকেই প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। নিউইয়র্ক থেকে এখানে প্রত্যাবর্তন করে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ এই কথা জানান।
অধ্যাপক আহমেদ জাতীয় আওয়ামী দলের (ওয়ালী মুজাফফর গোষ্ঠী) সভাপতি। তিনি বলেন, সাধারণ সভায় যারা কোনও পক্ষের সমর্থনে ভাষণ দেননি, এমনকি সেসব প্রতিনিধিদের মধ্যেও বাংলাদেশ প্রশ্নে বিপুল সহানুভূতি লক্ষ্য করা গেছে। তিনি বলেন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বহু সদস্যের সঙ্গে কথা বলার পর তারা

[৫] হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃষ্ঠা-২১৩

> আমাদের বাংলাদেশ প্রশ্নে নৈতিক সমর্থন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এইসব প্রতিনিধি এবং বহু মার্কিন সিনেটর মনে করেন যে, গত ৬ মাসের ঘটনাবলীর পর বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের অংশ হিসেবে থাকতে পারে না। বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। প্রশ্ন যেটা তা হল সময়ের।
> বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান সম্পর্কে আরব দেশগুলির মনোভাবের কথায় অধ্যাপক আহমেদ বলেন, কিছু আরব দেশসহ বিদেশী প্রতিনিধিরা আমাদের জানিয়েছেন যে, ঠিক সময় এলেই তারা আমাদের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য তৈরী।
> প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি লন্ডনে দলের নেতা পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রী ওয়ালী খান সমেত কয়েকজনের সঙ্গে মিলিত হন, তারাও বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক আহমেদ জেনেছেন যে পশ্চিম পাকিস্তানিরাও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।[৬]
>
> **স্বদেশ ॥ ১ : ৪ ॥ ২১ অক্টোবর ১৯৭১**

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত সাক্ষাৎকারদাতার বক্তব্য থেকে বিদেশি পত্রপত্রিকার কিছু সংবাদদাতার সাক্ষাৎ এবং আলোচনার তথ্য জানা গেলেও বিদেশি পত্রিকার তথ্যসূত্র হিসেবে এসব পত্রিকার ভূমিকা ছিল খুবই প্রান্তিক। কারণ, এ বিষয়ে কোনো লিখিত উৎস পাওয়া যায়নি।

কিন্তু তাই বলে বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলো দ্বারা পরিবেশিত সংবাদগুলোতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়নি তেমনটি নয়। এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত সংবাদ উপস্থাপনের উদাহরণ আছে অনেক। বৃটিশ পত্রিকা সানডে টাইমস তাদের প্রকাশিত এক রিপোর্টে বাংলাদেশে সংঘটিত নারকীয় ও পৈশাচিক অত্যাচার এবং গণহত্যাকে হিটলারের চেয়েও বর্বরোচিত হিসেবে আখ্যা দেয়। আরেকটি বৃটিশ পত্রিকা নিউ স্টেটসম্যান তাদের একটি রিপোর্টে প্রকাশ করে, 'বাঙলাদেশে আজ যা ঘটছে, তার মূলে আছে পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাস, তার কৃত্রিম ভৌগোলিকতা। আর কত রক্তের প্রয়োজন হবে এই কৃত্রিম রাষ্ট্রটির অবাস্তবতা উপলব্ধির জন্য।' আরেক প্রভাবশালী বৃটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণে মন্তব্য করে, জনগণের ভোটের রায়কে অস্বীকার করার ফলেই পাকিস্তানে বর্তমান যুদ্ধ। সেনাবাহিনী দ্বারা গণতন্ত্রকে প্রভাবিত করার অপচেষ্টা থেকেই বাংলাদেশের মানুষের ওপর যুদ্ধটিকে একরকম চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বলেই দাবি করে পত্রিকাটি। শুধু বৃটেন নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে যুদ্ধরত দেশটির সামগ্রিক চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে এনেছে।

[৬] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড, (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নভেম্বর ১৯৮২), পৃষ্ঠা-১৩০

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিরূপ অবস্থান সত্ত্বেও আমেরিকার প্রভাবশালী সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবেদনে প্রচার করে, 'যুক্তরাষ্ট্র সরকার যেভাবে অন্ধের মতো পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারকে সমর্থন করে চলেছে, তার ফলে পাক ভারত উপমহাদেশে মার্কিন স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে।' বিশ্ব মিডিয়াতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন দেখা যায় ফরাসী পত্রিকা ল্য ম'দ এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধেও। প্রবন্ধটিতে দাবি করা হয়, বাঙালিদের ওপর চালানো অমানুষিক অত্যাচারের ফলশ্রুতিতে বাঙালি ক্রমশও মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, যা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে ভিন্নতা দেখালেও সেসব রাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমগুলো ঠিকই মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। আর ওইসব প্রকাশিত সংবাদের একটি যুগপৎ প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় ছাপা হওয়া সংবাদ সংকলনগুলোতে। শুধু তাই নয়, বিদেশি রাষ্ট্র ও সংস্থা যেমন– জাতিসংঘের উপর সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। এমনকি জয়বাংলা (১) এ প্রকাশিত একটি সংবাদ সংকলনে নিউজিল্যান্ডের একজন পার্লামেন্ট সদস্যের বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকা পরিদর্শনপূর্বক দেয়া বিবৃতিতে পাক বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত বর্বরোচিত ধ্বংসযজ্ঞের বিষয়টি উঠে আসে। এমনকি সেই পার্লামেন্ট সদস্য নিউজিল্যান্ড পার্লামেন্টে এই অমানবিক অত্যাচারের বিষয়টি উত্থাপন করে এহেন বর্বরতার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সচেষ্ট হবেন বলে দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করেন বলে পত্রিকাটি জানায়। একই সংবাদ সংকলনে জয়বাংলা(১) দ্য টাইমস, গার্ডিয়ান ও ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি দলের বাংলাদেশ সফরের কথা জানায়। সেই প্রতিনিধি দল নিজ দেশে ফিরে গিয়ে বাংলাদেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কথা ব্যক্ত করে বলে পত্রিকাটি জানায়।

পাশাপাশি মার্কিন সাপ্তাহিক নিউজ উইকের একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল, 'বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।' ভিয়েনার পত্রিকা কাওনেন লেইটুঙ (Kaonen leitung) এ প্রকাশিত প্রবন্ধে পাঞ্জাবিদের প্রভুবাদকে দায়ী করা হয় পাকিস্তান ধ্বংসের জন্য। পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, ইয়র্কশায়ার পোস্টসহ আরও বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় সরাসরি সমালোচনা করা হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইয়াহিয়া খানের ভূমিকা নিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন জাপানি পত্রপত্রিকাতেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়। জাপানের প্রতিটি বহুল প্রচারিত

জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ঘোষণা করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সংঘাত বন্ধ করার জন্য প্রচেষ্টারত শক্তিগুলোকে ভয়াবহ পরিস্থিতি উদ্ভবের প্রধান কারণগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান করার উপদেশ দিয়েছিল। জাপানের প্রভাবশালী জাতীয় দৈনিক ইয়ুমিউরি সিমবুন এক নিবন্ধে লিখেছিল, বিগত কয়েক মাসে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী এমন দুর্জয় ও বিরাট আকার নিয়েছে যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২২ এবং ২৩ নভেম্বরের আক্রমণ দেখে তাকে ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণ ভেবে ভুল করেছে। এই পত্রিকাটি পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টকে নির্যাতনের বন্যায় বাংলাদেশের কণ্ঠ স্তব্ধ করার ভ্রান্তনীতি স্বীকার করে নেয়ার জন্য তার প্রতি আহ্বান জানায়। অপরদিকে দৈনিক মইচিনি সিমবুন বলেছে মার্চ মাসে বাঙালিদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে যাওয়ার পরই বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছে এবং দুর্জয় মুক্তিবাহিনীর জন্ম হয়েছে। আসাহি সিমবুন পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছিল 'বৃহৎ শক্তিবর্গের বর্তমান সঙ্কটের মূল কারণের প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখার কোনো যুক্তি নেই। জাপানি পত্রিকা হসিমবুনের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, বিগত নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ যে রায় দিয়েছে তার ভিত্তিতেই সমাধানের জন্য এগোতে হবে।

বৃটেনের রক্ষণশীল পত্রিকা ডেইলি টেলিগ্রাফে বলা হয়েছে - যতক্ষণ ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশ সমস্যার একটি যথার্থ রাজনৈতিক সমাধান না চাচ্ছেন ততক্ষণ তার বন্ধুহীনতা বাড়তে বাধ্য। বৃটিশ রক্ষণশীল দলের সমর্থক ডেইলি মেইল পত্রিকায় বলা হয়েছে- বৃটেন এখনও কেন পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে তার যুক্তি খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। কারণ, বাংলাদেশে এখন যা ঘটছে তা সুপরিকল্পিত গণহত্যা। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র প্রাভদাও পাকিস্তানের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। কেনিয়ার দি সানডে পোস্ট পত্রিকায় বলা হয়েছে পূর্ববাংলা সঙ্কটের মূল কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য। বৈদেশিক মুদ্রার বেশিরভাগ আয় করে পূর্ববাংলা। অথচ তাদেরকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাইমস পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের এক করুণ কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে ঢাকায় সামরিক শিবিরে নোংরা পরিবেশে ৫৬৩ জন নারীকে বন্দি করা হয়েছে এবং এরা অধিকাংশই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। মিসরের আধাসরকারি পত্রিকা আল আহ্‌রামের সম্পাদক ড. মকসুদ বলেছেন কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের নেতার নীরব কূটনৈতিক পন্থায় ইয়াহিয়াকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছেন। তারা বাংলাদেশের বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা বন্ধ করার জন্য

ইয়াহিয়াকে ব্যক্তিগত পত্র লিখেছেন। অধিকাংশ আরব মনে করেন, বাঙালিদের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বিদ্বেষমূলক মনোভাবের জন্য আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া হয়নি। আমেরিকান (জেসুইট খৃস্টানদের) পত্রিকা আমেরিকান উইকলি অব জেসুইটস অব ইউনাইটেস্টেস অ্যান্ড ক্যানাডা পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে - বাংলাদেশে যা ঘটেছে তার জন্য ইয়াহিয়া খানের কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী। বিখ্যাত ফরাসি সাপ্তাহিক পত্রিকা লেক্সপ্রেসে বলা হয়েছে - রক্ত ঝরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন বাংলদেশ। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার জঙ্গিবাহিনী এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তারা জানে না এ যুদ্ধে তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত। আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে, সারা পাকিস্তানের ৮০ ভাগ সম্পদের মালিক হলো পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবার। এই ২২টি পরিবারের চক্রান্তই বিশেষভাবে বর্তমান যুদ্ধের জন্য দায়ী। টাইমস অব লন্ডন পত্রিকা মারফত জানা যায়, ২০০ জন বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আহ্বান জানিয়ে বিলে স্বাক্ষর করেন। [৭]

তবে তৎকালীন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়ক সংবাদ কিংবা বিশ্বের অন্যান্য দেশে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি ও গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর প্রকাশিত সংবাদগুলো কিছু অংশের পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এসব সংবাদ উপস্থাপনের একটি বড় উদ্দেশ্যই ছিল রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করা।

[৭] হাসিনা আহমেদ (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃষ্ঠা-১৯২

Dhaka University Institutional Repository

পত্রপত্রিকাগুলোতে প্রতিফলিত
পাঠক মতামত

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর পরিচিতি থেকে শুরু করে এগুলোর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং এসব সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। যৌক্তিক কারণেই পরবর্তী জিজ্ঞাস্য হয় যে, পত্রপত্রিকার পাঠকের এসব প্রকাশনা সম্পর্কে অভিমত কী ছিল? তবে তা বিশ্লেষণ করার আগে জানা প্রয়োজন, এসব পত্রপত্রিকার পাঠক মূলত কারা ছিলেন? এসব পত্রিকা কীভাবে পাঠকের হাতে পৌঁছাত সে বিষয়টিও জানা আবশ্যক। এ বিষয়ে *জয়বাংলা* পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক ও মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবিব বলেন,

> পত্রিকা ছাপানো তখনকার সময়ের প্রেক্ষিতে সম্ভব ছিল না। কিছু কিছু কাগজ সাইক্লোস্টাইলে বের হত। তবে সীমান্তের ওপারে ভারত থেকে যে কাগজগুলো বেরুতো, প্রচুর রিফিউজি সেখানে ছিল। এই কাগজগুলো মূলত ডিস্ট্রিবিউশন হতো দেশের ভেতরে। রাতের অন্ধকারে যখন গেরিলা বাহিনী দেশে ঢুকতো তখন কাগজগুলো ছড়িয়ে দিতো। দেশের মধ্যে রিফিউজিরা যাবার সময় পত্রপত্রিকাগুলো নিয়ে যেতো।[১]

একই তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় সাপ্তাহিক স্বাধীনতা পত্রিকার সম্পাদক অরুণাভ সরকারের সাক্ষাৎকার থেকেও। তিনি বলেন,

> বেশিরভাগ শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধারা এই সংবাদপত্রের গ্রাহক ছিলেন। তাছাড়া ত্রিপুরার যেসব লোক মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতেন তারা কিনে নিতেন। তবে মূল কথা হচ্ছে ওই সময় এমন পত্রিকার প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য।[২]

[১] হারুন হাবিব, সাক্ষাৎকার ।

[২] অরুণাভ সরকার, সাক্ষাৎকার।

এই দুটি মৌখিক উৎস থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয় তা হলো, রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা, শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত লোকজনই শুধু নন, সীমান্তবর্তী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী নাগরিকরাও এসব সংবাদপত্রের পাঠক ছিলেন। তবে শুধু তারাই নন, এসব সংবাদপত্রের একটা বড় পাঠক ছিলেন বিভিন্ন মুক্তাঞ্চল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতেও। এ বিষয়টি সম্পর্কে জানা যায় রৌমারী মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক অগ্রদূত* পত্রিকার সম্পাদক আজিজুল হকের সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য থেকে। আজিজুল হক তার পত্রিকার প্রচারের ব্যাপ্তির বিষয়ে তার যুক্তি তুলে ধরেন নিম্নোক্তভাবে:

> পুরো রৌমারী, নদীবিধৌত এলাকাগুলো মুখ্যত এই পত্রিকার প্রচারস্থল ছিল। কুড়িগ্রামের বিশাল একটা অংশ, উলিপুর থানা, চিলমারী থানার পুরোটা, পুরো রৌমারী, এদিকে জামালগঞ্জ থানার অংশ এটাই ছিল মুখ্যত অগ্রদূত পত্রিকার পাঠক এলাকা। এসব এলাকায় পত্রিকাটির ছিল দুর্দান্ত চাহিদা।[৩]

রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এসব পত্রপত্রিকার চাহিদা ছিল আকাশচুম্বী। বরিশাল প্রেসক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ২০০০ সালে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকায় *বরিশালের সংবাদপত্র ও সাময়িকী (১৮৫৯-২০০০)* শীর্ষক প্রবন্ধে বরিশালের *দৈনিক আজকাল* পত্রিকার সম্পাদক তপংকর চক্রবর্তী বলেন,

> বিপ্লবী বাংলাদেশ ছিল রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের মুখপত্র। কাজেই পত্রিকাটির জন্য রোববার মুক্তিযোদ্ধারা উন্মুখ হয়ে থাকতেন। রোববার দুপুরের মধ্যে পত্রিকা পৌঁছে যেতো সব ক্যাম্পে। পত্রিকা হাতে পেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সে কী উল্লাস! মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পগুলোতে পত্রিকাগুলো বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে বিলি করা হত। বরিশাল পটুয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে পত্রিকা রাতের আঁধারে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ফেলে রেখে যেতেন মুক্তিযোদ্ধারা।[৪]

[৩] আজিজুল হক, সাক্ষাৎকার।

[৪] তপংকর চক্রবর্তী, *বরিশালের সংবাদপত্র ও সাময়িকী (১৮৫৯-২০০০)*, (স্মারক পুস্তিকা, বরিশাল প্রেসক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব, ডিসেম্বর ২০০০), পৃষ্ঠা - ৩৭

মুক্তিযুদ্ধপ্রবণ বাংলাদেশে এসব পত্রপত্রিকা সহজলভ্য হয়ে উঠতে পারেনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের কড়া নজরদারির কারণে। পত্রিকাগুলো দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করার লোকও ছিল অপ্রতুল। তবুও ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু পত্রিকা যে অনিয়মিতভাবে হলেও বিভিন্ন স্থানে পৌঁছত তার সাক্ষ্য মেলে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা জনাব আব্দুল মান্নান খানের সাক্ষাৎকারে। মুক্তিযুদ্ধকালীন ছাত্রাবস্থার সেই দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন,

> *জয় বাংলা* পত্রিকাটি প্রথম নজরে আসে যশোরের সাফদারপুরে। অনেক কষ্ট করে দুই কপি পত্রিকা সংগ্রহ করি। এরপর দুই কপি পত্রিকা নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেই। পথিমধ্যে কয়েকবার পাকিস্তানি মিলিটারীদের তল্লাশীর মুখে পড়তে হয়। নিজের বুদ্ধিমত্তা ও ভাগ্যগুণে এসব বাধা পেরিয়ে পত্রিকা দু'টো সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করি। তখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রচারণামূলক যে কোনো কিছুই প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ ছিল। এত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েও শান্তিনগরে এক চায়ের দোকানের সামনে সুকৌশলে এক কপি পত্রিকা রেখে সটকে পড়ি। আরেক কপি পত্রিকা ঢাকা জিপিও'র সামনে চলন্ত বাস থেকে ফেলে দেই। এই কাজ দুটি করার পর আমি যুদ্ধজয়ের মতো আনন্দ পেয়েছিলাম।[৫]

অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষের কাছে এসব পত্রিকার জনপ্রিয়তার কথা জানা যায় মাওলা ব্রাদার্স থেকে ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত সুকুমার বিশ্বাসের *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী* গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন,

> এদেশে মানুষ স্বাধীন বাংলা বেতারে সংবাদ শুনবার জন্য যেমন ঘর বন্ধ করে আলো নিভিয়ে উৎকর্ণ হয়ে থাকতো। তেমনি মুক্তিযুদ্ধের এক চিলতে খবরের জন্যও হন্যে হয়ে ফিরতো। চারদিকে হাজারো বিপদের মুখেও হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকা এ বাড়ি, ও বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি পৌঁছাতে গিয়ে অনেক কচি প্রাণ ধরা পড়েছে। শত্রুর হাতে নির্যাতন ভোগ করেছে এবং তাদের উষ্ণ রক্তে রঞ্জিত করেছে এদেশের মাটিকে।[৬]

[৫] আবদুল মান্নান খান, ১৯৭১ *এক সাধারণ লোকের কাহিনী*, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০), পৃষ্ঠা: ৪৬-৪৮
[৬] সুকুমার বিশ্বাস, মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, এপ্রিল ১৯৯৯), পৃষ্ঠা - ২৪৬

Dhaka University Institutional Repository

পাঠক মতামত

দেখা যাচ্ছে যে, আলোচ্য পত্রপত্রিকাগুলোর পাঠক মূলত ছিলেন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালিরা। এখানে ওই শ্রেণীর মনোভঙ্গি প্রকাশ পেলেও সামগ্রিকভাবে শ্রেণী-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের আকাঙ্ক্ষা কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা দরকার। নিম্নে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর কয়েকজন পাঠকের মতামত তুলে ধরা হলো ঃ

দেবী রায়
গৃহিণী, নেত্রকোনা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালেই মার্চ মাসের শেষদিকে আমাদের পুরো পরিবার নেত্রকোনার প্রত্যন্ত গ্রাম সিংগারগাঁও এলাকায় চলে যাই। সেখানে মাস চারেক থাকার পর পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে আমাদের চলে যেতে হয় সীমান্তবর্তী ইনাংবাজার শরণার্থী শিবিরে। পরবর্তীতে ইনাংবাজারসহ রংঢ়া ও বাঘমারা শরণার্থী শিবিরের প্রতিটিতেই আমি পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহখানেক করে অবস্থান করি। আমি সেসময় কলেজের ছাত্রী ছিলাম। শরণার্থী শিবিরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের লিফলেট দেখতাম। পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের খবর ও যুদ্ধ সংগঠিত হবার খবর সম্বলিত কিছু হাতে লেখা পত্রিকাও চোখে পড়েছে। যদিও সেগুলোর নাম এখন আর তেমন মনে নেই। বিক্ষিপ্তভাবে আমার হাতেও মাঝেমধ্যে এসব পত্রপত্রিকা আসতো। তবে সবগুলো সংবাদ পড়া হতো না। খাবার সংগ্রহ করে জীবন বাঁচিয়ে রাখাই ছিল দায়। তারপরও আমার যতটুকু মনে পড়ে এ পত্রিকাগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে উৎসাহ সৃষ্টি ও শরণার্থী শিবিরে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের মনে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার আশা সঞ্চার করার লক্ষে সংবাদ পরিবেশন করা হতো।

মাহমুদ আনোয়ার
সাংবাদিক, ঢাকা

পাবনার ঈশ্বরদীতে নিজ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমি উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র ছিলাম। যুদ্ধ শুরুর পরপরই নিরাপত্তার স্বার্থে কলকাতায় চলে যাই। স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করি। বয়স কম থাকায় অনুসন্ধিৎসু মন সবকিছুতেই আগ্রহী হয়ে উঠত। আর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোনো সভা, মিটিং কিংবা খবর ছিল তখন আমার অন্যতম আগ্রহের বিষয়। পুরো কলকাতা চষে বেড়াতাম সে সময়গুলোতে। বিভিন্ন জায়গার মতো শিয়ালদহ রেল স্টেশনেও নিয়মিত যাওয়া হতো। সেখানে কমবয়সী এক পত্রিকার হকারের কাছ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত *জয়বাংলা* পত্রিকাটি নিয়মিত পড়ার সুযোগ হয়েছিল। পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্যই ছিল স্বাধীনতার স্বপক্ষে মানুষকে সচেতন এবং আশান্বিত করে তোলা। পাশাপাশি রণাঙ্গনের খবর এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা এ পত্রিকার খবরের মধ্য দিয়ে বোঝা যেত। তখনকার সময়ে পেশাদার পত্রিকাগুলোর মতো এতটা নিখুঁত ছিল না পত্রিকাটি। তবে সংবাদের গভীরতা ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে কিছু হাতে লেখা পত্রিকাও বিভিন্ন জনকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে দেখেছি। যদিও সেগুলো আমার পড়ার সুযোগ হয়নি।

হাসান আজিজুল হক
কথাসাহিত্যিক, রাজশাহী

মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমি খুলনার বিএল কলেজের শিক্ষক ছিলাম। সেসময়টাতে এক ধরনের অবরুদ্ধ জীবনযাপন করেছি। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে আমাদের কয়েকজনের চেষ্টায় *সন্দীপন* নামে একটি ছোট কাগজ অল্প সময় প্রকাশ করতাম। পাঠক সংখ্যা ছিল একেবারেই সীমিত। আর যুদ্ধ শুরুর পর পুরো খুলনায় পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকাররা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রকাশ্যে কোনো ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সুযোগ দিত না। সে সময়টায় শুধু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানই ছিল আমার ভরসা। আমি তখন শুনেছিলাম প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মুক্তাঞ্চলের কিছু মানুষের উদ্যোগে বেশ কিছু পত্রপত্রিকা প্রকাশের খবর। কিন্তু এর কোনোটিই আমার নজরে আসেনি কিংবা খুলনায় কেউ পড়েছে বলেও শুনিনি।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ রশীদুজ্জামান
অধ্যক্ষ, কালিগঞ্জ পাবলিক কলেজ, লালমনিরহাট

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি রংপুরের কারমাইকেল কলেজ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। যুদ্ধ শুরু হলে ৬নং সেক্টরের অধীনে যুদ্ধে যোগ দিই। এসময় মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে যে পত্রিকাগুলো প্রকাশ হয়েছিল তার অধিকাংশই আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল এবং এর কিছু অংশ এখনও আমার সংগ্রহে আছে। সে সময় উত্তরাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল *রণাঙ্গন* নামের পত্রিকাটি। অনেকগুলো জেলায় এর পাঠক ছিল। মুক্তাঞ্চলের মানুষের পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্রে বসেই আমরা পত্রিকাগুলো পাঠের সুযোগ পেয়েছি। পত্রিকাগুলোর সংবাদ নিঃসন্দেহে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ যোগাতো, অনুপ্রাণিত করতো। সংবাদগুলো ছিল অনেকটা ছোটগল্পের মতো। মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ডকেই বিশেষভাবে ফলাও করে উপস্থাপন করা হতো। আমরা বিভিন্ন এলাকার মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ড, রাজাকারদের অপতৎপরতা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশকে নিয়ে ভাবনার বিষয়গুলো জানতে পারতাম এই পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে।

ড. রফিকুল হক
উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া আমার জন্মস্থান। সেখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। ১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত এ এলাকাটি মুক্তাঞ্চলই ছিল। তবে আমাদের মধ্য থেকেই একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় ১৪ এপ্রিলের পর এলাকাটি পাকবাহিনীর দখলে চলে যায়। তারপর আমরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যাই। যুদ্ধের একপর্যায়ে মে-জুন এই দুই মাস আমি আগরতলায় যুবক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিতে যাই। সেখানে প্রায় নিয়মিতই *বাংলার বাণী* পত্রিকাটি চোখে পড়ত। যেখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংবাদই ছিল মুখ্য। খুব বেশি সময় পেতাম না পত্রিকা পড়ার জন্য। কারণ, প্রশিক্ষণ নিয়েই আমাদের ব্যস্ত সময় কাটতো। এর ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু দেখেছি তাতে এই পত্রিকাটিতে মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীন বাংলাদেশের চেতনাকেই জাগ্রত করার চেষ্টা দেখেছি। এর পাশাপাশি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের চরমপত্র অনুষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে শোনা হতো।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত পাঠকদের মতামতের দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হতো তা যথেষ্ট সফল ছিল। তার কারণ পাঠকরা একমাত্র এসব পত্রিকাতেই মুক্তিযুদ্ধের আসল পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পেতেন। পত্রপত্রিকাগুলো যেহেতু শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত পাঠকরাই পড়তেন, ফলে এর প্রাথমিক প্রভাব এদের ওপরই পড়ত বেশি। এই পাঠকদের মাধ্যমে গণমানুষের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনের খবর পৌঁছতো- অর্থাৎ ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভাবটা পড়ত পরোক্ষভাবে। অন্যদিকে 'স্বাধীনবাংলা বেতার', ভারতীয় 'আকাশবাণী' এবং ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (বিবিসি) শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই একইসাথে শ্রবণ করতে পারত। ফলে এগুলোর প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী এবং বিবিসি উপস্থাপিত তথ্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও মুদ্রিত তথ্যের ওপর পাঠকের যে আকাঙ্ক্ষা তা নিরসনে এসব পত্রপত্রিকাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। তবে আরেকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে যে, পাঠক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পত্রিকাগুলোর প্রচারসংখ্যা ও ব্যাপ্তির অপ্রতুলতার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের পাঠকের কাছে এগুলো সহজলভ্য ছিল না। এর একটি বড় কারণ ছিল তৎকালীন পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের কড়া নজরদারি। এই অপ্রতুলতা সত্ত্বেও প্রচারাধীন অঞ্চলগুলোতে এ পত্রপত্রিকাগুলো পাঠকদের মাঝে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে বাংলার আপামর মানুষের আত্মত্যাগ, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা, বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল অন্যান্য রাষ্ট্রের সহায়তার পাশাপাশি মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকাও ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এদেশের মূলধারার গণমাধ্যমগুলোর অগ্রণী ভূমিকা পালনের কথা থাকলেও সেগুলো ছিল পাকিস্তান সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই বাস্তবতায় পাঠকের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের চালিকাশক্তি ও মুখপত্র হিসেবে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত হয় অনেক পত্রপত্রিকা। যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকৃত ঘটনা সবার সামনে তুলে ধরা এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ মুক্তিকামী মানুষকে সংগঠিত ও উজ্জীবিত করা। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো মুক্তিযুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ বাংলাদেশের খবর, নির্যাতন, গণহত্যা, মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছে বস্তুনিষ্ঠভাবে। পাশাপাশি রণাঙ্গনের নানা বিষয়ও বহুমাত্রায় স্থান পেয়েছে এসব পত্রপত্রিকার অগ্নিঝরা পাতায়।

মুক্তিযুদ্ধকালীন মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত যেসব পত্রপত্রিকা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত এবং যেগুলো সম্পর্কে এই গবেষণায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে সেগুলো হলো - *অমর বাংলা*, *অগ্রদূত*, *অভিযান*, *আমার দেশ*, *আমোদ*, *অগ্নিবাণ*, *ইশতেহার*, *উত্তাল পদ্মা*, *ওরা দুর্জয় ওরা দুর্বার*, *গণমুক্তি*, *গ্রেনেড*, *জয়বাংলা (১)*, *জয় বাংলা (২)*, *জয় বাংলা (৩)*, *জয় বাংলা (৪)*, *জন্মভূমি*, *জাগ্রত বাংলা*, *জাতীয় বাংলাদেশ*, *দাবানল*, *দুর্জয় বাংলা*, *দেশ বাংলা*, *ধূমকেতু*, *নতুন বাংলা*, *প্রতিনিধি*, *বঙ্গ বাণী*, *বাংলার কথা*, *বাংলার বাণী*, *বাংলার ডাক (১)*, *বাংলার ডাক (২)*, *বাংলার মুখ*, *বাংলাদেশ (১)*, *বাংলাদেশ (২)*, *বাংলাদেশ (৩)*, *বাংলাদেশ (৫)*, *বাংলাদেশ (৬)*, *বাংলাদেশ (৭)*, *বাঙলাদেশ*, *বিপ্লবী বাংলাদেশ*, *মায়ের ডাক*, *মুক্ত বাংলা (১)*, *মুক্ত বাংলা (২)*, *মুক্তি (১)*, *মুক্তি (২)*, *মুক্তিযুদ্ধ*, *রণাঙ্গন (১)*, *রণাঙ্গন (২)*, *রণাঙ্গন (৩)*, *লড়াই*, *স্বদেশ*, *স্বাধীনতা (প্রতিরোধ)*, *স্বাধীনতা*, *স্বাধীন বাংলা (৩)*, *স্বাধীন বাংলা (৪)*, *স্বাধীন বাংলা (৫)*, *স্বাধীন বাংলা (৬)*, *সংগ্রামী বাংলা (১)*, *সংগ্রামী বাংলা (২)*, *সাপ্তাহিক বাংলা*, *সোনার বাংলা (১)*, *সোনার বাংলা (২)*, *সোনার বাংলা (৩)*।

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত এই বিপুল সংখ্যক সংবাদপত্রের নেপথ্যে কাজ করেছে এক একটি পৃথক রাজনৈতিক মতাদর্শ। যেসব সংবাদপত্র মুক্তাঞ্চল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিকদের হাত দিয়ে প্রকাশ হতো সেগুলোতে আদর্শগতভাবে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার প্রভাব দাবি করা হলেও বেশিরভাগে এমন সংশ্লিষ্টতা মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ পরিবেশনে সংবাদপত্রগুলোর যে মূল লক্ষ্য সেটি থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো পরোক্ষ শক্তি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকে সফল করার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে প্রাথমিক তথ্যউপাত্তের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত অসংখ্য পত্রপত্রিকা সকল প্রকার দমন-নিপীড়ন উপেক্ষা করে দেশের মুক্তিকামী মানুষের কথা বলেছে, তাদের পাশে থেকেছে, সাহস জুগিয়েছে, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠন করে বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে, যা এই গবেষণায় ব্যবহৃত মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর প্রতিবেদন এবং সেগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক, প্রকাশক ও মুক্তিযোদ্ধাগণের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো কতিপয় ব্যক্তিগত উদ্যোগ ব্যতীত, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হিসেবে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সব পত্রপত্রিকা খবর প্রকাশ করেছে একটি মাত্র লক্ষ্য নিয়েই– আর তা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। দলীয় দৃষ্টিকোণ আংশিকভাবে সংবাদ প্রকাশের ভঙ্গিকে প্রভাবিত করলেও সামগ্রিক বিচারে এক ও অভিন্ন 'স্বাধীন বাংলাদেশ' এর দাবিটি ছিল মূল লক্ষ্য।

এসব পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রনাঙ্গনের বস্তুনিষ্ঠ খবর, হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের নৃশংসতার খবর প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধেও পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে দৃঢ় ভূমিকা পালন করেছে। পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের

সংগঠিত করা এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর সংবাদ ও প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, সংবাদ বিশ্লেষণ ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই গবেষণায় সংগৃহীত পাঠক মতামতে আরও যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হলো- এসব পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ শুধু মুক্তিযোদ্ধাদেরকেই সংগঠিত করেছে তা নয়, অবরুদ্ধ বাংলাদেশ ও শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া মুক্তিকামী মানুষকেও আশান্বিত করেছে, সাহস জুগিয়েছে অফুরন্ত। গুরুত্ব বিচারে, মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলো ছিল মুক্তিযুদ্ধের এক একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের দিনলিপি থেকে তাঁদের সাহসী অভিজ্ঞতার কথাও প্রকাশ পেয়েছে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর পাতায়। এভাবে জনসাধারণের কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের 'ইমেজ' সৃষ্টির যে প্রয়াস এ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় এসব পত্রপত্রিকায় তার প্রভাব ছিল দুর্দমনীয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জনসমর্থনের বিষয়টি একটি সর্বজনীন রূপ লাভ করেছিল, যার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় সমগ্র দেশের গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেয়া সাহসী যোদ্ধাদের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতায়। এক্ষেত্রে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত খবর ও প্রতিবেদনের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব যে ছিল তা অস্বীকার করা চলে না।

বিশ্বজনমত গঠনের ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর অবদান এই গবেষণায় পর্যালোচনা করা হয়েছে। মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত সাক্ষাৎকারদাতার জবানিতে বের হয়ে এসেছে বিশ্ব মিডিয়ার প্রচারিত সংবাদের নেপথ্যে এসব পত্রপত্রিকায় উপস্থাপিত সংবাদের ভূমিকা।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষ একমাত্র এসব পত্রিকাতেই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পেতেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে উপস্থাপিত তথ্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও মুদ্রিত তথ্যের ওপর পাঠকের যে আকাঙ্ক্ষা তা নিরসনে এসব পত্রপত্রিকাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। নানা প্রতিকূলতার কারণে এই পত্রপত্রিকাগুলোর প্রকাশনা ও প্রচারের ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা সত্ত্বেও প্রচারাধীন অঞ্চলগুলোতে এই

পত্রপত্রিকাগুলো পাঠকদের মাঝে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। সার্বিক বিবেচনায় যে বিষয়টি জোর দিয়ে বলা যায় তা হলো- যে উদ্দেশ্য নিয়ে পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হতো তা যথেষ্ট সফল ছিল।

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা সংক্রান্ত এসব বিষয় বিশদ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণায়। তবে অপ্রতুল গবেষণা উপকরণ ও সময়ের অপ্রতুলতায় যথোচিত গভীরতার অনুপস্থিতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হয়তো মনোনিবেশ করা যায়নি। তাই এ বিষয়ে আরও বিশদ গবেষণা প্রয়োজন বলে মনে করি। তবে এই গবেষণাকর্মটি এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস:

পত্রিকাসমূহ

অমর বাংলা, অগ্রদূত, অভিযান, আমার দেশ, আমোদ, অগ্নিবাণ, ইশতেহার, উত্তাল পদ্মা, ওরা দুর্জয় ওরা দুর্বার, গণমুক্তি, গ্রেনেড, জয়বাংলা (১), জয় বাংলা (২), জয় বাংলা (৩), জয় বাংলা (৪), জন্মভূমি, জাগ্রত বাংলা, জাতীয় বাংলাদেশ, দাবানল, দুর্জয় বাংলা, দেশ বাংলা, ধূমকেতু, নতুন বাংলা, প্রতিনিধি, বঙ্গ বাণী, বাংলার কথা, বাংলার বাণী, বাংলার ডাক (১), বাংলার ডাক (২), বাংলার মুখ, বাংলাদেশ (১), বাংলাদেশ (২), বাংলাদেশ (৩), বাংলাদেশ (৫), বাংলাদেশ (৬), বাংলাদেশ (৭), বাঙলাদেশ, বিপ্লবী বাংলাদেশ, মায়ের ডাক, মুক্ত বাংলা (১), মুক্ত বাংলা (২), মুক্তি (১), মুক্তি (২), মুক্তিযুদ্ধ, রণাঙ্গন (১), রণাঙ্গন (২), রণাঙ্গন (৩), লড়াই, স্বদেশ, স্বাধীনতা (প্রতিরোধ), স্বাধীনতা, স্বাধীন বাংলা (১), স্বাধীন বাংলা (২), স্বাধীন বাংলা (৩), স্বাধীন বাংলা (৪), স্বাধীন বাংলা (৫), স্বাধীন বাংলা (৬), সংগ্রামী বাংলা (১), সংগ্রামী বাংলা (২), সাপ্তাহিক বাংলা, সোনার বাংলা (১), সোনার বাংলা (২), সোনার বাংলা (৩)

সাক্ষাৎকার (১)

(মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সম্পাদক ও নিজস্ব প্রতিবেদক)

১। সরকার, অরুণাভ, মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক স্বাধীনতা পত্রিকার সম্পাদক।
২। হক, আজিজুল, মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত অগ্রদূত পত্রিকার সম্পাদক।
৩। হাবীব, হারুন, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত জয় বাংলা পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক ও মুক্তিযোদ্ধা।

সাক্ষাৎকার (২)

(মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার পাঠকসমূহ)
১। আনোয়ার, মাহমুদ, সাংবাদিক, ঢাকা।
২। রশীদুজ্জামান, মোঃ, অধ্যক্ষ, কালিগঞ্জ পাবলিক কলেজ, লালমনিরহাট।
৩। রায়, দেবী, গৃহিণী, নেত্রকোনা।
৪। হক, ড. রফিকুল, উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৫। হক, হাসান আজিজুল, কথাসাহিত্যিক, রাজশাহী।

অন্যান্য উৎস:

গ্রন্থ

১। আকতার, খালিদা, *পত্রপত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ*, ফরিদ কবির (সম্পাদিত), *হৃদয়ে আমার বাংলাদেশ*, (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২)।

২। আহমেদ, হাসিনা (সংকলিত ও সম্পাদিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫)।

৩। আহমেদ, হাসিনা (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, চতুর্থ খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭)।

৪। আহমেদ, হাসিনা (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, পঞ্চম খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮)।

৫। আহমেদ, হাসিনা (সম্পাদিত ও সংকলিত), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, নবম খণ্ড, (ঢাকা: অনন্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮)।

৬। কাদির, মুহাম্মদ নুরুল, দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, (ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, মার্চ ১৯৯৭)।

৭। কামাল, মাহবুব (অনূদিত), ও হক, মনিরুল (প্রকাশিত), 'বিদেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ'। প্রকাশকাল: আগস্ট, ২০১০ (চতুর্থ মুদ্রণ)।

৮। খান, আবদুল মান্নান, ১৯৭১ *এক সাধারণ লোকের কাহিনী*, (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০)।

৯। চৌধুরী, আবদুল মান্নান (ছদ্মনাম: আবুল হাসান চৌধুরী সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ*, (ঢাকা: মোর্শেদা চৌধুরী, ফেব্রুয়ারি ২০১৪)।

১০। বিশ্বাস, সুকুমার, মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, এপ্রিল ১৯৯৯)।

১১। রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ষষ্ঠ খণ্ড, (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, নভেম্বর ১৯৮২)।

১২। রাজীব, আবু নাসের (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বিবিসি*, (ঢাকা: বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম এন্ড কমিউনিকেশন ও দ্য ব্রিটিশ কাউন্সিল, এপ্রিল ২০০১)।

১৩। সরকার, অরুণাভ, *আমার স্বাধীনতা*, (ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ প্রকাশনা

১। কামাল, সুফিয়া, *একাত্তরের ডায়েরী থেকে*, (ঢাকা: দৈনিক সংবাদ, নভেম্বর ২৫ ১৯৯৯)।

২। খান, হাশেম, স্মৃতি '৭১ ও ক্ষুদে মুক্তিযোদ্ধা, (ঢাকা: দৈনিক জনকণ্ঠ, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩)।

৩। চক্রবর্তী, তপংকর, *বরিশালের সংবাদপত্র ও সাময়িকী (১৮৫৯-২০০০)*, (স্মারক পুস্তিকা, বরিশাল প্রেসক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব, ডিসেম্বর ২০০০)।

৪। ভূঁইয়া, শরীফ উল্লাহ, ও হোসেন, আশফাক, বাংলাদেশের অভ্যুদয়পর্বে জাতিসংঘের ভূমিকা: মুক্তাঞ্চলের তিনটি পত্রিকার দৃষ্টিতে, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, প্রবন্ধাবলী, খণ্ড-৫, ডিসেম্বর ২০০৪)।

৫। রাব্বী, মোহাম্মদ ফজলে, *কাগজের নৌকা*, (কুমিল্লা: ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৬২), *মুক্তিযুদ্ধে সংবাদপত্র: আমোদ*, (কুমিল্লা: বিনয় সাহিত্য সংসদ, ডিসেম্বর ২০০০)।

৬। হাবিব, হারুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী (সাক্ষাৎকার: লে: জেনারেল জে. এস. অরোরা)*, (ঢাকা: দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৬)।

৭। হোসেন, সেলিনা, *রুদ্ধশ্বাসের দিনগুলো*, রশীদ হায়দার (সম্পাদিত), ১৯৭১: *ভয়াবহ অভিজ্ঞতা*, (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, মে ১৯৯৬)।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের মানচিত্র

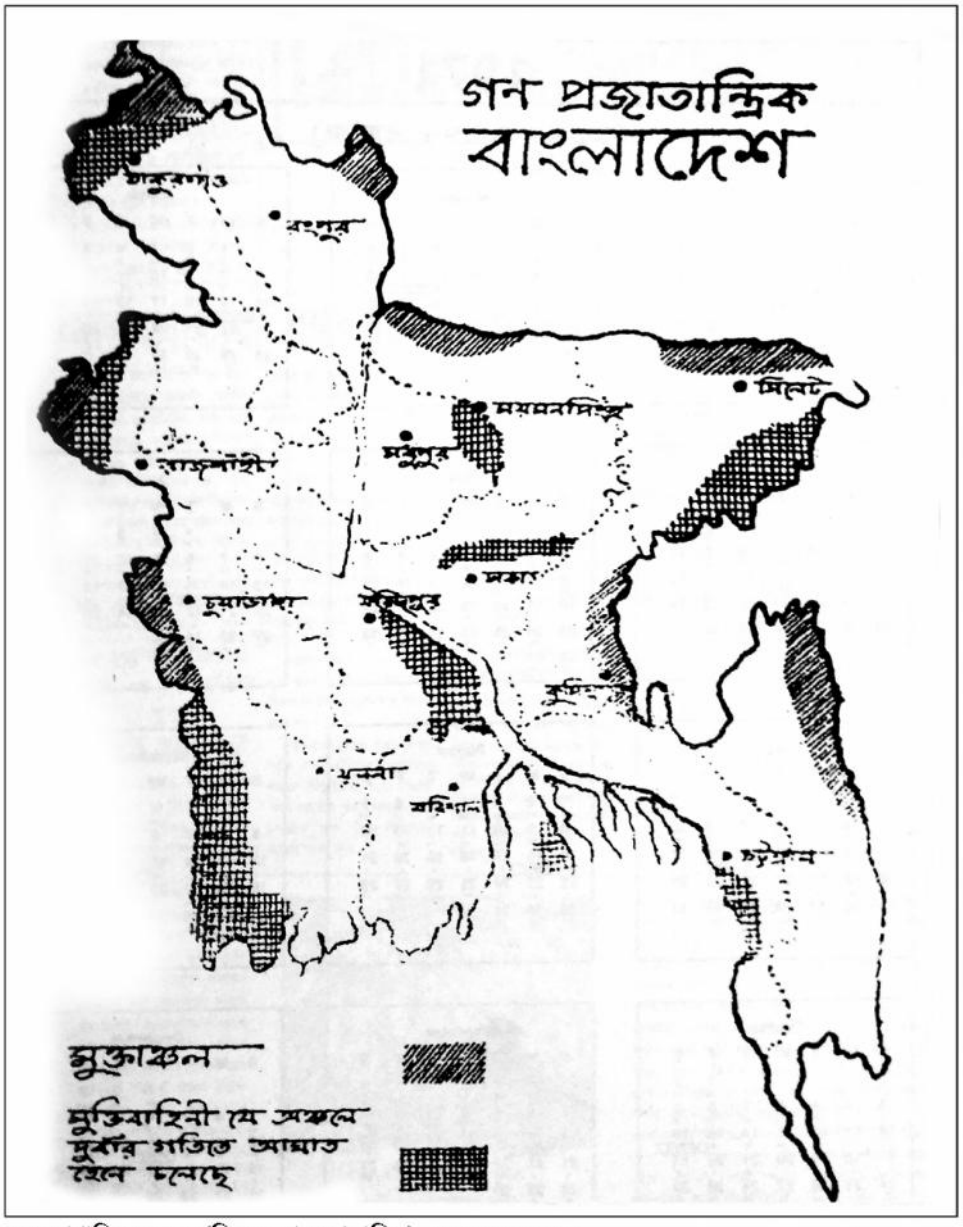

সূত্রঃ সাপ্তাহিক জনমত (বিলেত থেকে প্রকাশিত), ৭ নভেম্বর ১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার

সম্পাদক ও সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকারের প্রশ্নপত্র

১। কেন এই পত্রিকা বের করলেন?

২। মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে যে পত্রপত্রিকাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, এসবের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা কেমন ছিল বলে মনে করেন?

৩। মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় রণাঙ্গনের খবরগুলো কারা পাঠাতেন? তারা কি পেশাদার সাংবাদিক ছিলেন? তাদের কয়েকজনের পরিচিতি। তাদের পাঠানো রিপোর্টগুলোর প্রবণতা কী ছিল?

৪। গণহত্যার বিবরণ এসব পত্রপত্রিকায় কীভাবে উঠে এসেছে?

৫। রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা কেমন ছিল?

৬। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের দৈনন্দিন ঘটনাপ্রবাহ মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে? এ খবরগুলোতে কোন ধরনের প্রবণতা আপনি লক্ষ্য করেছেন?

৭। বিশ্বজনমতকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আকৃষ্ট করতে মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী বাংলাদেশি সরকার থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলোর ভূমিকা কতটুকু ছিল?

৮। এসব পত্রিকার পাঠকসংখ্যা কেমন ছিল? তারা কারা ছিলেন?

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার

অরুণাভ সরকার

সম্পাদক, সাপ্তাহিক স্বাধীনতা

সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : অরুণাভ সরকারের বাসভবন, ধানমণ্ডি ১৯ (নতুন ১০/এ), ঢাকা।
সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪।
সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা।

আপনার পত্রিকাটি কোন উদ্দেশ্যে/কেন বের করলেন?

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুক্তিযুদ্ধের বা মুক্তিযোদ্ধাদের যে খবরাখবর আছে সেগুলো প্রচার করা খুব জরুরি বিষয় ছিল। সেইজন্যে। সেই প্রয়োজনটা যতটুকু পারি মেটানোর জন্য আমি পত্রিকা করি।

একটু বিস্তারিত যদি বলতেন

এ কথাত বিস্তারিতভাবে বলার কিছু নেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা অনেকেই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গিয়েছিলাম। ভারতের পত্রপত্রিকা আমাদের এই সমস্যা, আমাদের সঙ্কট খুব ভালোভাবে বুঝতেও হয়তো পারতনা। কোনো দেশই পারে না, এক দেশেরটা আরেক দেশ। তারপর, কি করে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা উৎসাহ পাবে? সেসব বিষয়গুলো তখন জানানোরও খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই প্রয়োজনটা মেটানোর জন্য আমি আমার...। আমি এর আগেও তো, সীমান্তের ওপারে যাওয়ার আগেও আমি এদেশে সাংবাদিকতা করতাম। কাজেই এ কাজটা আমি পারতাম। আমি একা এ কাজটা করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম।

আপনার দৃষ্টিতে মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর রাজনৈতিক বিভাজন কিংবা সম্পৃক্ততাটা কেমন ছিল?

না, সেটা তো বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি থেকেও পরে পত্রিকা করে। যেমন জয় বাংলা বেরিয়েছিল সম্পূর্ণ আওয়ামী লীগের টাকায়। এরকম অন্য কোনো কোনো দলেরও, যেমন কমিউনিস্ট পার্টি। এরাও বিভিন্ন পত্রিকা করেছে। কোনো কোনো সময় দল হয়তো করেনি, কিন্তু কোনো দলের কোনো একজন নেতা হয়তো তার টাকাপয়সা দিয়ে একটা পত্রিকা করেছে। এগুলো পরে হয়েছে। আমার বিষয়টা ওইরকম ছিল না।

আমি কোনো দল করতাম না। আওয়ামী লীগও না, কমিউনিস্ট পার্টিও না, জামায়াতে ইসলামও না। পলিটিক্সের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত, সংবাদপত্রের একটা যোগাযোগ ছিল। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত কোনো যোগাযোগ ছিল না রাজনীতির সঙ্গে। যদিও রাজনীতি ছাড়া কোনোভাবেই দেশ চলতে পারে না, এ কথাও যেমন সত্য। তেমনি এটাও সত্য, আমি একটা মাত্র জিনিসকে কিছুটা ঘৃনা করি, কিছুটা কেন অনেকটাই, সেটা হচ্ছে রাজনীতি। যদিও আমার বন্ধুরা কেউ কেউ রাজনীতি করেন। কেউ কেউ মন্ত্রী ইত্যাদি আছেন। সবাই হয়তো মিথ্যা কথা বলেন না। কিন্তু রাজনীতিতে এতো বেশি মিথ্যার প্রাধান্য, প্রাবল্য যে আমি তা পছন্দ করি না।

রণাঙ্গনের সংবাদগুলো পত্রপত্রিকাগুলো কারা পাঠাতেন? তারা কি পেশাজীবী সাংবাদিক ছিলেন?

না। সাধারণত না। যুদ্ধের খবর, যুদ্ধে যারা গেছেন, তাদের সঙ্গে আমরা সরাসরি যোগাযোগ করে, তাদের মুখ থেকে তা জেনে নিতাম। অনেক সময় তারাও এসে আমাদের জানাতেন। তারপর, দেশে পাকিস্তানিরা মানুষের ওপর কি ধরনের অত্যাচার করছে সে কাহিনীগুলো শরণার্থীদের কাছ থেকেই জানা যেতো।

তাদের যে প্রতিবেদনগুলো পেতেন, সেগুলোর প্রবণতাগুলো কী ছিল? প্রকাশিত সংবাদগুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তি/দল কিংবা ঘটনার প্রতি অনুরাগ কিংবা বিরাগের বিষয় ছিল কিনা?

আসলে সেগুলো তো আর রিপোর্ট না। রিপোর্ট হচ্ছে যা ঘটবে তার হুবহু বর্ণনা দেয়া। মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখলে সেটা আর যাই হোক, সাহিত্য হতে পারে, কিন্তু রিপোর্ট হয়না। রিপোর্ট হতে হলে সেটাকে অবজেকটিভ হতেই হবে। আর কোনো কিছু যদি প্রাধান্য পেয়ে থাকে তবে সেটা দেশের স্বাধীনতা, আর কিছু না।

সংগৃহীত তথ্যের কোনো যাচাই করা ব্যবস্থা ছিল?

না। ওইরকম তো আর সুযোগ ছিল না। যে ঘটনা ঘটে গেছে, পরে গিয়ে তো সেটা আর চেক করাও যেত না। এসব ক্ষেত্রে যাদের ওপরে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যাত ছিল। তাদের রিপোর্টই গ্রহণ করতাম। বাকিদেরটা গ্রহণ করতাম না। আর আমার পত্রিকায় তো আমি একাই সবকিছু লিখতাম। সম্পাদনা করতাম। সবকিছু

একা। শুধু আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী বোধহয় একবার লিখেছিলেন একবার একটা প্রবন্ধ। এরকম হঠাৎ দু'একটা প্রবন্ধ কারও কারও গিয়েছে। তাছাড়া নিউজ সবকিছু আমি এক হাতে করেছি।

অন্য পত্রিকাগুলো তো আপনি পড়েছেন। ওগুলোতে কি কখনো অতিরঞ্জন কিংবা তথ্য চেপে যাওয়ার কোনো বিষয় নজরে এসেছে আপনার?

না। ওই সময় মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে আন্ডার-প্লে করে ছোট করে লিখে কারও পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। আর ওই যুদ্ধটা এমনই বড় ছিল যে ওটাকে আর অতিরঞ্জিত করা যেতো না। ওটা নিজেই অনেক উঁচু, অনেক বড়।

আপনার কাছে যারা খবর পাঠাতেন, কারও পরিচয় চাচ্ছিলাম।

ওইরকম কারও কথা এখন মনে নেই। এরকম পাঠানোর তো কোনো সুযোগও ছিল না। পাঠানোর মতো লোকও ছিল না।

আপনার বইতে দেখলাম, মুক্তাঞ্চল থেকে প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা এটি। এই তথ্যের প্রমাণ কি কোনোভাবে করা সম্ভব?

না। বিশ্বাস করলে লোকে করবে, না করলে কিছু করার নেই। যদি কেউ বিশ্বাস নাও করে, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আপনার প্রবন্ধে যদি আমার কিংবা আমার বইয়ের নাম না আসে তাতেও আমার কিচ্ছু আসে যায় না।

গণহত্যার বিবরণগুলো কীভাবে উঠে আসতো?

শরণার্থী যারা তাদের কাছ থেকে জেনে নিতাম।

পত্রিকাগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করতে কীভাবে ভূমিকা পালন করেছে?

আমি ওই উদ্দেশে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছি। কিন্তু তারপর কি হলো, সেটা আমার ব্যাপার না। যদি সংগঠিত হয় তো খুব ভালো। কিন্তু যদি না হয় তাতে আমার কিছু করার ছিল না। আমি তো আর রাজনৈতিক নেতা

ছিলাম না। আমি তো আর মিলিটারি লিডারও ছিলাম না। কিন্তু যতটুকু জেনেছি, লোকে তখন আগ্রহ নিয়ে এই নিউজ এবং ভিউজগুলো পড়ত এবং পছন্দ করত।

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ঘটনাগুলো পত্রিকায় কীভাবে উপস্থাপিত হতো?

এ নিয়ে রিপোর্ট ছাপা হতো। তবে যেখানেই যখন যুদ্ধ সংঘটিত কিংবা মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিত হওয়ার বিষয়গুলো হতো, আমি আমার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন কিংবা সংবাদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে (নিউজ এবং ভিউজ) সেগুলোকে আমি সমর্থন করেছি।

এ পত্রিকাগুলো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে কি ভূমিকা পালন করেছে?

আমার মনে হয় না ওই ব্যাপারে এসব পত্রিকাগুলো খুব একটা ভূমিকা রাখতে পেরেছিল। কারণ এই পত্রিকাগুলোর ভাষা ছিল বাংলা। বহির্বিশ্বে এগুলোর কোনো প্রভাব ছিল না। তবে পত্রিকাগুলো এ দেশের রাজনৈতিক নেতাদের ওপর প্রভাব ফেলত। এবং তারা হয়তো বহির্বিশ্বে, তথা ভারত থেকে শুরু করে আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন, জাপানসহ প্রভৃতি দেশে এসব সংবাদকে প্রচার করার জন্য উদ্যোগ নিতেন।

আমাদের এই পত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত সংবাদগুলোকে বাইরের দেশে প্রকাশিত সংবাদমাধ্যমে অনূদিত হয়েছে?

তারা হয়তো দিয়েছে। কিন্তু সেটা আমি জানি না।

মূল পাঠক সংখ্যা কেমন ছিল?

পাঠক সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। সর্বসাকূল্যে হয়তো দুই-তিন হাজার কপি। যেখান থেকে পত্রিকাটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই, সেখানে কোনো ভালো প্রেসও ছিল না। অফসেট প্রেসও ছিল না। ছিল লেটার প্রেস। যে দুই-তিন হাজার কপি ছাপা হতো তার পুরোটাই বিক্রি হয়ে যেত। ঠিক মনে নেই তবুও দামও ছিল ৪ আনা।

গ্রাহক কারা ছিলেন এই সংবাদপত্রের?

বেশিরভাগ শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধা এই সংবাদপত্রের গ্রাহক ছিলেন। তাছাড়া ত্রিপুরার যেসব লোক মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করতেন তারা কিনে নিতেন। আমার অবশ্য ওই গ্রাহকের সঠিক সংখ্যাটা জানা নেই। তবে মূল কথা হচ্ছে ওই সময় এমন একটা পত্রিকার দরকার ছিল। ওই সময় বের করেছি। এরপর এর কোনো দরকার হবে বলে আমার মনে হয়নি। আমি পরে এই পত্রিকা বের করব, করে বড়লোক হব, এসব চিন্তা আমার মাথায় ছিল না।

ওই সময় প্রবাসী সরকারের কাছ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর কোনো অনুমতির বিষয় ছিল কী?

অনুমতির কোনো বিষয় তখন ছিল না। তবে বাংলাদেশ সরকারের পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের রুহুল আমিন চৌধুরী পত্রিকাগুলোর ১০০-২০০ কপি কিনে নিতেন। ওখানে আরও ছিলেন মিজানুর রহমান চৌধুরী, এমআর সিদ্দিকী, হান্নান সাহেব, আব্দুল্লাহ আল হারুন।

প্রবাস থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে কী দেখতেন?

তখনকার দিনের কথা তো আর মনে নেই। তবে যতটুকু মনে আছে অধিকাংশ পত্রিকাই মুক্তিযুদ্ধকে সাপোর্ট করত।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার

আজিজুল হক

সম্পাদক, অগ্রদূত
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : আজিজুল হকের ছেলের বাসভবন, শ্যামলী (ওভারব্রিজ সংলগ্ন), ঢাকা।
সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১২ মে, ২০১৪।
সময় : সন্ধ্যা ০৬:৩০ ঘটিকা।

আপনার কিংবা এ ধরনের পত্রিকাগুলোর পাঠকসংখ্যা কেমন ছিল?

এ ধরনের পত্রিকা ওখানে তোর আর ছিল না। শুধু আমারটাই ছিল।

আপনার পত্রিকার পাঠক ব্যাপ্তিটা কতটুকু ছিল?

পুরো রৌমারী, নদীবিধৌত এলাকাগুলো মুখ্যত। কুড়িগ্রামের বিশাল একটা অংশ, তারপর উলিপুর থানা, চিলমারী থানার পুরোটা, পুরো রৌমারী, এদিকে জামালগঞ্জ থানার অংশ এটাই ছিল মুখ্যত আমার পাঠক এলাকা। এসব এলাকায় পত্রিকাটি হটকেকের মতো বিক্রি হত।

পত্রিকাগুলো বিলি করতেন কীভাবে?

বিলিটা হতো কিছু ছেলেপেলের হাত ধরে। আধুনিক যে হকার পদ্ধতি, সেটাই অনুসরণ করা হতো। আমার বাসা, মানে যেখান থেকে মুদ্রণ হতো, সেটাও একটা সেলস সেন্টার হত। বাসার এলাকার লোকজন বাসা থেকেই কিনত। আশপাশের এলাকাগুলোতে ওই ছেলেপেলেগুলো নিয়ে যেত।

এক একটি ইস্যুতে কতগুলো সংখ্যা বের করতেন?

দুই, আড়াই কিংবা তিন হাজার সংখ্যা হবে হয়তো।

দামটা কত ধরা হয়েছিলো?

এত আগের কথা, মনে নেই আসলে।

কতদিন পরপর প্রকাশ হতো ওটা?

সাপ্তাহিক। প্রতি সপ্তাহেই পত্রিকাটি বের হতো নিয়মিত।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার থেকে পত্রিকাগুলো তো বের হয়েছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। কিন্তু মুক্তাঞ্চল থেকে যে পত্রিকাগুলো বের হয়েছে, যেমন আপনার অগ্রদূত কিংবা অন্য যে পত্রিকাগুলো ছিল, সবই তো নিশ্চয় ব্যক্তিগত উদ্যোগেই বেরিয়েছে। তাই নয় কী?

আমার এই পত্রিকার বিশেষত্ব হলো, আমার নিজ নামেই সম্পাদিত পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। আমার আসল নাম আজিজুল হক, সেই নামেই সম্পাদক হিসেবে পরিচয় নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশ করা হতো। কিন্তু অন্য পত্রিকাগুলোর ক্ষেত্রে তেমনটা খুব একটা দেখা যায়নি। যেমন জয়বাংলা পত্রিকার কথাই যদি বলা হয়, মান্নান সাহেব পত্রিকাটির সম্পাদনা করলেও পত্রিকার পাতায় সম্পাদকের নাম হিসেবে দেয়া হতো আহমদ রফিক। কিন্তু আমি এই মিথ্যাচারের আশ্রয় নিইনি। আমার বাসা মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিল সাবজোনাল অফিস। ওখানে ম্যাজিস্ট্রেট থাকত, সিএ ডেভেলপমেন্ট ছিল। ওরা হাসত আর আমাকে বলত, 'মাস্টার সাহেব আপনার দুর্দান্ত সাহস। যদি শুধু এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়, কোথায় ঝুলবেন আপনি।' আমার উত্তরটা ছিল, 'এমনিতেও ঝুলব, ওমনিতেও ঝুলব। কিন্তু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নয়।'

স্বনামে পত্রিকা প্রকাশের কারণে হুমকি কেমন পেতেন? অনেকেই তো ছদ্মনাম নিতেন।

হ্যাঁ, যারা রিপোর্টার, তাদের নাম সবসময় আমরা দিইনি। কারণ যারা অধিকৃত এলাকা থেকে রিপোর্ট করত, তাদের সঙ্গে শর্তই ছিল যে তাদের নাম প্রকাশ করা হবে না। কারণ নাম প্রকাশ করলে ওরা ওখানে থাকবে কীভাবে?

খবরগুলো কারা পাঠাত? মুক্তিযোদ্ধারাই?

বিভিন্নজন। যারা এই লাইনে ইন্টারেস্টেড ছিল তারাই পাঠাত।

তারা যে খবর পাঠাত। ওই সংবাদের সত্যতা নিয়ে আপনার অভিমত।

না না ওরা জেনুইন মানুষ। সবাই আমাদের পরিচিতই ছিল। একজন অপরিচিত হলে আমাদের পরিচিত লোকদের দ্বারা তাকে ভেরিফাই করে তবেই তার প্রেরিত সংবাদ প্রচারযোগ্যতা পেত।

এই পত্রিকাগুলোতো বাইরেও যেতো? কাটিং করে সোর্স হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বিশ্বজনমত গঠনে এ পত্রিকাগুলো কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছে?

বিবিসি দিত। ওরা আমাদের রেফারেন্স দিয়ে সংবাদ দিত। আসলে কিছু ভুল হয়েছে। যদিও আসলে সময়ও ছিল না, অবসরও ছিল না, সুযোগও ছিল না। যার জন্য ওইসব জিনিস আর সংগ্রহে রাখা সম্ভব হয়নি।

আপনার পত্রিকার নিউজ কাটিং বিবিসি বা ইন্ডিয়ার কোন কোন পত্রিকায় নিত?

বিভিন্ন পত্রিকাই নিত। একবার কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে সাংবাদিক সুমন্ত সেন এসেছিলেন। দেখা করে গেছেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডির ভাই রবার্ট কেনেডি রৌমারী সফর করে গেছেন। পত্রিকা সহ আমার ছবি উঠিছেয়েন। এটা ওদের এনবিসিতে প্রচার হয়েছে। আমাদের ওখানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ইনচার্জ ছিলেন তার নাম ছিল লে. কর্নেল নুরুন্নবী সাহেব। উনি একবার লন্ডনে বিবিসি হাউসে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন আমার স্কুল গ্রাউন্ডের মুক্তিযোদ্ধাদের প্যারেডের ছবি, আমাদের পত্রিকার ছবি বিবিসি হাউসের দেয়ালে টাঙানো। উনি দেখে তো হতবাক! পরে তিনি ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন। যেসব দেশে এ ধরনের লিবারেশন ফাইট হয়, সেসব দেশের গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো, বিবিসি অনেকদিন সংগ্রহ করে। ওখানে আমার পত্রিকাও সংগ্রহ করা আছে।

বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি তৎকালীন পত্রিকাগুলো পড়েছি। যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ডায়েরি প্রকাশিত হতো। আপনারাও কি অগ্রদূতে তেমন জিনিসগুলো ছাপাতেন?

এতদিন পর এখন তো আর সেসব বিষয় মনে নেই। আজকের কথা তো না।

মুক্তিযোদ্ধাদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডগুলোকে কিভাবে তুলে ধরতেন?

আমার পত্রিকায় একটা কলাম ছিল। অন্যান্য নিউজ তো থাকতই। রণাঙ্গনের সংবাদগুলোর মধ্যেই সার্বিক পরিস্থিতিটা উঠে আসত। কোথায় মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ চালালো, কিংবা রাজাকার মারা হলো, সবকিছুই উঠে আসত।

খবর যারা পাঠাত তাদের মধ্যে পেশাদার সাংবাদিক কতজন ছিল আপনার পত্রিকায়?

হারুন হাবিব সাহেব তো তখন বাচ্চা মানুষ। যদিও জয় বাংলা পত্রিকায় কাজ করত। পাশাপাশি আমার পত্রিকাতেও নামে বেনামে লেখা দিয়েছে।

পত্রপত্রিকাগুলোর রাজনৈতিক মতাদর্শ বিষয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী?

আমার দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। আমি আগেও দল করেছি। এখনও করি। আমি এখনও রৌমারীতে আওয়ামী লীগের থানা সভাপতি। কিন্তু যখন আমি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কথা বলি, তখন দলের আদর্শ থেকে বের হয়ে আসি। যেহেতু ইতিহাস, সেহেতু পক্ষপাতিত্বের জায়গাটা থেকে বের হতে হয়।

আপনার আশপাশে আর কী কী পত্রিকা বেরুত?

আমার আশপাশে ওখানে আর পত্রিকা বের হতো না। কিছু পত্রিকা আসত ভারত থেকে। বিক্ষিপ্তভাবে জয়বাংলা পত্রিকাটাও আসত। আপনাকে একটা মজার ঘটনা বলি। আমাদের ওখানে হাইস্কুলের পেছনে একটা জলাশয় আছে। রবার্ট কেনেডি যখন আসলেন তখন কাদের সিদ্দিকী ওখানে ছিলেন। লতিফ সিদ্দিকীও ছিলেন। আমাদের এই অঞ্চলের যারা মুক্তিযোদ্ধা সবাই যেতেন। রবার্ট বললেন, আমরা মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটা বই করতে চাই। তোমরা কীভাবে যুদ্ধের অপারেশন কর, নদী কীভাবে পাড়ি দাও সেগুলো নিয়ে। আমাদের মুখের কথা ওদের সবকিছু বিশ্বাস হচ্ছিল না। তখন কাদের কতগুলো ছেলে নিয়ে জলাশয়ের ওই পাড়ে গেল। পরিকল্পনা ছিলো হাতে স্টেনগান নিয়ে সবাই সাঁতরে এপাড়ে আসবে। বেশ গভীর পানি। তো আসার সময় একজনের স্টেনগান পানিতে ডুবে গেল। ময়েজউদ্দীন নামে একজন স্পটটা দেখে নিয়ে ডুব দিয়ে পানির নিচে অনেক্ষণ কাটিয়ে স্টেনগানটা তুলে নিয়ে আসল। ময়েজউদ্দীনের কাণ্ড দেখে রবার্ট কেনেডি বলতে বাধ্য হলেন, বাংলাদেশ ক্যান এচিভ লিবার্টী। নো ওয়ান ক্যান টেক ইট।

ময়েজকে সাবাস দিলেন। তখনকার দিনের মানুষের এই যে স্পিরিট সেটা ভোলার নয়। যদিও ইতিহাসের পাতায় এসব সাধারণ ময়েজউদ্দীনের নাম লেখা থাকবে না।

পত্রিকা সবসময় মানুষকে প্রভাবিত করে। উৎসাহ দেয়, অনুপ্রাণিত করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কিংবা উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলোর ভূমিকা কেমন ছিল বলে আপনার মত?

চিলমারীতে ছোট ছোট অপারেশন হতো। একবার মুক্তিযোদ্ধারা অনেক রাজাকার ধরে নিয়ে এলো। ২৫ - ৩০ জনকে একসঙ্গে। ওদের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলাম, ওরা মুক্তিযুদ্ধ কি সেটাই বোঝেনি। ওদেরকে উল্টা বোঝানো হয়েছে। তো ওদের কাউকেই মারা হলো না। বরং ওদেরকেই আমরা মুক্তিযোদ্ধা বানালাম। মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-রান্নাবান্না বা সহায়তার কাজ করানো হতো। যদিওবা ওদের হাতে রাইফেল তুলে দেয়া হয়নি। দলে দলে মানুষ ওদের দেখতে আসত। কর্নেল তাহের তখন ওখানে ছিলেন। তাহের সাহেব আমাকে বললেন যে ওই লোকদের মারা যাবে না। দেখি এই এদের কনভার্ট করেই মুক্তিযুদ্ধে... ওদের কেউ আর বিট্রে করেনি আমাদের সাথে। ওরা কম শিক্ষিত লোক বলেই ওদেরকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ডুবিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল পাকিস্তানি দোসরদের।

রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা হলো, এ খবরটা যখন প্রকাশ করলেন তখন ওটার রেসপন্স কেমন ছিল?

এটা আসলে বোঝানো সম্ভব নয়। ওটা নিজ থেকে বুঝে নিতে হবে। আজকে তো আর এ ঘটনাগুলো নেই। কিছু জিনিস তখনকার পুরো প্রেক্ষাপটটাকে কনসিডার করে, কল্পনাই করে নিতে হবে। এটা যদি আপনি বুঝতে না চান, আপনি ব্যর্থ। আপনার কাজও ব্যর্থ হবে। তখনকার মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ওসমানী আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। কে যায়নি! মন্ত্রীরা পর্যন্ত রৌমারী গিয়ে আমাকে ধন্যবাদ দিতেন। বিদেশি সাংবাদিক – সায়মন ড্রিং, এন্থনি মাসকারেনহাস, এলেন গিন্সবার্গ ওরা একটা টিম হিসেবে আমার ওখানে গিয়েছিল।

পত্রিকার খরচগুল কীভাবে বহন করতেন?

পত্রিকার খরচ বহন করতে আমাকে কিছুটা সাহায্য করেছে জোনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধ যখন হয় তখন কি আপনি শিক্ষকতায় ছিলেন?

ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের একটা সুবিধা ছিল। যেটা যেদিন ঢাকায় ওইদিন ওই প্রোগ্রামটা রৌমারীতে করতাম। বাংলাদেশের আর কোনো থানায় যেটা সম্ভব ছিল না। বাজারে ভিস্যাট সিস্টেমের ওয়্যারলেস ছিল। ওটা অপারেট করতেন আনোয়ার নামের অত্যন্ত উদ্যোগী একজন তরুণ। ওই ওয়্যারলেস পুরো মুক্তিযুদ্ধের যোগাযোগে প্রচণ্ড সাহায্য করেছে। সেই অয়্যারলেস যোগেই আমরা সব খবর তাৎক্ষণিকভাবে পেতাম। রৌমারী স্কুলে চাকরীতে ছিলাম। কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা হয়নি। ওখানে যখন প্রথম তিস্তা ব্রিজে অপারেশন চলছিল তখন আমরা কখনোই চাইনি পাকিস্তানিরা তিস্তা পার হয়ে উত্তরে আসুক। তখন আমাদের অস্ত্রের অবস্থাও দুর্বল। সামান্য কয়েকটা থ্রিনটথ্রি রাইফেল। তারওপর গুলি নেই। নানা অসুবিধা। চেষ্টা চালানো হলো ভারতের সাথে গোলাবারুদের জন্য। খুব রেস্ট্রিকটেড উপায়ে আমাদের কিছু গোলাবারুদ দিল। সেই গোলাবারুদগুলো আমার স্কুলের ল্যাবরেটরিতে রাখতাম। একরাত রেখে পরদিনই তিস্তা ব্রিজের যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয়া হতো। একদিন প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ায় গোলাবারুদের চালান বিঘ্নিত হলো। অসাবধানতাবশত অস্ত্রের চালান ছড়িয়ে পড়ল স্কুলগ্রাউন্ডে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় সেদিন কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

আপনার বয়স তখন কত ছিল?

৩৮ কিংবা ৩৯ এর মতো। এখন আমর ৭৯ বছর চলছে।

ভাষা আন্দোলনের সময়...

আমি তিন যুগের মানুষ। আমি বৃটিশ পিরিয়ডে ছোট হলেও সব বলতে পারি। পাকিস্তান পিরিয়ডের সব কথাই তো জানি। মুক্তিযুদ্ধ তো করলাম। এখন আবারও যুদ্ধ করছি।

পত্রিকাগুলো সবই তো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেই ছিল। কিন্তু চীনপন্থী-রাশিয়াপন্থী কিংবা ন্যাপ ভাসানীপন্থীদের মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো ধারাগত পার্থক্য...

এসব পার্থক্য ছিল একান্ত ভেতরের বিষয়। নেতৃত্বের বড় পর্যায়ের বিষয় ছিল ওই পার্থক্যগুলো। এমনকি শরণার্থী শিবিরেও এ পার্থক্যের ছাপটা ছিল। চীনপন্থীরা চীনপন্থীদের সাথে থাকবে, ন্যাপের লোক ন্যাপ এর লোকের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু সবার ঐকমত্য স্বাধীনতার বিষয়ে ছিল। তাই চলার পথটা ভিন্ন হলেও মূল চাওয়াটা এক থাকায় ওখানটায় কোনো সুস্পষ্ট ফারাক ছিল না।

শরণার্থী শিবিরগুলোতে আপনার পত্রিকা যেত? সাধারণ মানুষ পড়ত কেমন? এর সার্কুলেশন কোথায় কোথায় ছিল?

শরণার্থী শিবিরগুলোতে যেত। সাধারণ মানুষ তো পড়তই। লুকোছাপা ছিলনা। যেগুলো মুক্তাঞ্চলের বাইরে যেত সেখানে কিছুটা লুকানোর বিষয় ছিল। বিভিন্ন জায়গায় যেতো। দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর, চিলমারী, কুড়িগ্রাম, ইন্ডিয়া এসব জায়গায় যেত বলে আমার জানা আছে। দেশের ভেতর পাঠক খুব একটা নিয়মিত ছিল না। ফেরি করে তো আর অধিকৃত অঞ্চলে কেউ পত্রিকা বিক্রি করতে পারত না। যারা যারা জানত তারা গোপনে পত্রিকা সংগ্রহ করত। একটা কথা যোগ করি। ওয়্যারলেস অপারেটর আনোয়ারের কাছ থেকে খবর পেলাম ঢাকায় বাংলাদেশের পতাকা তৈরির কথা। আমার স্ত্রী সেই পতাকা রৌমারীতে বসে তৈরি করে। সেই পতাকা আমরা তৈরি করে ভারতে পাঠাই। আসামের অ্যাসেম্বলী হলের সামনে সেই পতাকাটা টাঙিয়ে স্যালুট করে সব এমপি মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দিলেন। কিন্তু সেটা আমার পত্রিকা শুরু করার আগে হয়েছে বিধায় ওটার কোনো খবর অগ্রদূতে আসেনি। এছাড়া যুদ্ধের সময় এমন কোনো অফিসার নেই যে আমার বাসায় যায়নি। সবার আতিথেয়তার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল আমার স্ত্রীর হাতে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ '৭০ এর নির্বাচন কিংবা মার্চের আন্দোলনে আপনার ব্যক্তিগত ভূমিকা কী ছিল?

নেতাদের নির্দেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ছিলাম। এই আর কি।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলনে আপনার সংশ্লিষ্টতা।

আমার এক শিক্ষক ছিলেন ভাষা সৈনিক। উনি তখন জগন্নাথের ছাত্র, ঢাকায় লেখাপড়া করতেন। উনার কাছ থেকে তার মিটিং মিছিলের কথা শুনেছি। অনুপ্রাণিত হয়েছি।

আপনার পড়ালেখার...

এখন যেমন প্রতি থানায় একাধিক কলেজ। আমাদের সময় তো তেমন ছিল না। এক ছিল বগুড়ায় আজিজুল হক কলেজ, রংপুরে কারমাইকেল কলেজ, সৈয়দপুরে ভেন্না কলেজ, গাইবান্ধায় গাইবান্ধা কলেজ। এই কয়টা কলেজই সম্বল ছিল। আমার পড়ালেখা গাইবান্ধায়। গাইবান্ধা কলেজে লেখাপড়ার পর রাজশাহী থেকে বিএড করেছি।

আপনার পরিবারে শিক্ষার অবস্থা কেমন ছিল?

মোটামুটি। আমার ছোটবেলায় আমার বাবা মারা যান। উনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার ছিলেন। উনিও রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ ছিলেন। তখন ঢাকা থেকে পত্রিকা যেত না। কিন্তু মনে আছে কলকাতা থেকে আমাদের বাসায় পত্রিকা আসত। শিক্ষা ও রাজনীতির একটা আবহ ছেলেবেলা থেকেই প্রভাবিত করত।

আপনার ছেলেমেয়েদের কথা বলবেন?

আমার চার ছেলে চার মেয়ে। ছেলেগুলো সব মাস্টার্স পাস করেছে। বড় মেয়ে মাস্টার্স, কলেজের লেকচারার ছিল। তার আবার দুই ছেলে। তাদের একজন পাইলট, আরেকজন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছে। তার পরের মেয়ে আমার স্কুলের শিক্ষিকা। বড় ছেলে সুপ্রিমকোর্টের উকিল। মেজ ছেলে রৌমারীতে ব্যবসা করে। সেজ আর ছোট ছেলে ঢাকাতেই আছে। প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে।

আপনি রৌমারী স্কুল থেকে অবসর নিয়েছেন কবে?

১৯৮৫'র দিকে। তারপর অবশ্য সরকার থেকে ৫ বছর চাকরি বর্ধিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ওই সময় আপনার পত্রিকায় লেখা পাঠাত এমন কেউ কি পরবর্তী সময় খ্যাতি পেয়েছেন, হারুণ হাবিবের মতো...

না তেমন কেউ নেই। স্থানীয়ভাবে কয়েকজন আছেন যাদেরকে সবাই চেনে, জানে। কিন্তু ওদের নাম আসলে ওভাবে আর মনে করতে পারছি না।

খবরগুলো কিভাবে পাঠাত?

লেখা তো সংখ্যায় সীমিত। আর সবার লেখাই মোটামুটি চিনতাম। কারও না কারও মারফত হাতে করে পাঠিয়ে দিত। আমি পেয়ে যেতাম। যে নিয়ে আসত, সে মুক্তিযুদ্ধের জিনিস হিসেবে খুব যত্ন করে তা নিয়ে আসত। এমনকি সেই সব বার্তাবাহক খুব সাধারণ মানুষের অবদানও অস্বীকার করার মতো নয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তো আপনি একজন পূর্ণবয়স্ক কর্মঠ মানুষ ছিলেন। পাশাপাশি শিক্ষিত ছিলেন।

খুব মোটাসোটা ছিলাম না। সুগঠিত দেহ ছিল। যে কারণে যে কোনো কাজেই প্রচণ্ড কর্মোদ্যম পেতাম।

পত্রিকা শুরু করার পরিকল্পনাটা কীভাবে এলো?

এই পত্রিকার পেছনে নুরুন্নবী সাহেবের অবদান আছে। জিয়াউর রহমানের অবদান আছে। আমার পত্রিকার ওপর জে রহমান লেখা আছে। আসলে এসব কথাতো বলা যায় না। এসব কথাকে ইতিহাস বলা চলে না। কিন্তু অতীতের কথা ঘাটলে কথাগুলো উঠে আসে। জিয়াউর রহমান সাহেবেরও তখন সমস্যা ছিল। পরিবার ছিল তার অধিকৃত বাংলাদেশের অংশে। তখন তো তিনি মেজর জিয়া ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে মাস্টার সাহেব, সব জিনিস কিন্তু একুরেট করা যায় না। এদিক ওদিক কিছু কাটছাঁট করতে হয়। আমাদের অনেকেই তো ভেতরে আছে তাই হয়তো কিছু জিনিস রাখঢাক করা দরকার। তো সেই কারণে জেড রহমানের বদলে তার নামটা করলাম জে রহমান। আর মেজরের জায়গায় ব্যবহার করলাম ব্রিগেডিয়ার। তো খোঁজ করুক পাকিস্তানি আর্মি ব্রিগেডিয়ার জে রহমানকে। তো তখন একদিন লেফটেন্যান্ট নুরুন্নবীকে আমি বললাম পত্রিকা শুরু করার ব্যাপারে। নুরুন্নবী সাহেব কথা বললেন জিয়াউর রহমানের সঙ্গে। তিনিও একবাক্যে রাজি হলেন। 'অগ্রদূত' নামটি অবশ্য আমি আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম।

অগ্রদূত নামে একটি পুরনো পত্রিকার সন্ধান পাওয়া গেলেও সেই পত্রিকার সঙ্গে আমার পত্রিকার বিস্তর পার্থক্যের জন্য সে বিষয়টি আর আমলে আনা হয়নি। কথা প্রসঙ্গে কেনেডি সাহেব 'অগ্রদূত' শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলেন। অর্থ শুনে তিনি যথেষ্ট খুশি হয়েছিলেন।

কতদিনের প্রস্তুতি ছিল পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের আগে?

একটা পত্রিকা প্রকাশের জন্য পরিকল্পনা আর প্রস্তুতির প্রয়োজন সে সময়টা আমি নিয়েছি।

কিন্তু সেই পত্রিকা শুরু করার পেছনে মানসিক ভাবনাটা কি ছিল?

আমার পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় আমার যে বক্তব্য আছে সেটাই আমার সে উদ্দেশ্যটি প্রকাশ করতে সমর্থ। সেই সংখ্যাটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলা একাডেমিতে পাবেন। রংপুর সেনানিবাসে যে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসংবলিত জাদুঘর, সেখানেও কিছু কপি পাবেন। সাইক্লোস্টাইল ও রি-সাইক্লোস্টাইল করে কপিগুলো মোটামুটি বেশ কয়েকটি জায়গায় সংরক্ষিত আছে। আমার কথা হচ্ছে আমাকে যদি কেউ বাদ দেয়, তাহলে ১১ নম্বর সেক্টরের ইতিহাসটা সম্পূর্ণ হবে না। এগুলোকে বাদ দিয়ে ইতিহাস লিখলে সেই ইতিহাসটিও হবে ইতিহাসের মূলস্রোতের আংশিক রূপ। পত্রিকার প্রকাশটি ছিল সামান্য অর্থে উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযুদ্ধের বহুস্রোতের মোহনা ছিলাম অগ্রদূত এবং আমি। আর্মি অফিসার, বিদেশি সংবাদকর্মী থেকে শুরু করে সব বহিরাগত মুক্তিকামী ফৌজের মানুষের সাথে স্থানীয় অশিক্ষিত-শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষের যে মেলবন্ধন সেটার একটা মাধ্যম ছিলাম আমি। তবে আমার অগ্রদূত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত যে লেখাটি সেটিতে আমার মনোভাবটা পুরোটা বোঝা যাবে যে ঠিক কী কারণে আমার এ পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার

হারুন হাবীব

জয় বাংলা পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক ও মুক্তিযোদ্ধা
সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : হারুন হাবীবের বাসভবন, সাংবাদিক কলোনি, কালশী, মিরপুর, ঢাকা।
সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৪।
সময় : সকাল ১১:৩০ ঘটিকা।

মুক্তাঞ্চল কিংবা প্রবাসী সরকার থেকে যে পত্রিকাগুলো প্রকাশ হতো, সেগুলোর পাঠকশ্রেণী কারা ছিল?

আসলে মুক্তিযুদ্ধের ওই সময়টাতে মুক্তাঞ্চলের সব খবর আমি বলতে পারবনা। তবে এটুকু জানি যেহেতু আমি মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছি গেরিলা যুদ্ধের বাইরেও, আমি বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছি। বিশেষ করে রৌমারী মুক্তাঞ্চলের সাথে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম। অনেকদিন থেকেছি। সেখানে যে পত্রিকাগুলো বের হতো, সেগুলো বের করত মূলত আমাদেরই মানুষ, যারা মুক্তাঞ্চলে থাকত। সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষক, কবি। এ কাগজগুলো তখন সব আসলে প্রিন্ট করা সম্ভবও ছিল না। কিছু কাগজ সাইক্লোস্টাইলে বের হতো। তবে সীমান্তের ওপারে ইন্ডিয়া থেকে যে কাগজগুলো বেরুত, প্রচুর রিফিউজি সেখানে ছিল। ওগুলো আবার ইন্ডিয়ান ছাপাখানায় ছাপা হতো। এই কাগজগুলো মূলত ডিস্ট্রিবিউশন হতো দেশের ভেতরে। রাতের অন্ধকারে যখন গেরিলা বাহিনী দেশে ঢুকত তখন কাগজগুলো ছড়িয়ে দিত। দেশের মধ্যে রিফিউজি যারা আসত, যারা অনেকে ভেতরে যেত, তাদেরকেও ছড়িয়ে দেয়া হতো। এবং মূলত এসব পত্রপত্রিকাকগুলোর কোনো পেশাদার রিপোর্টার ছিল না। মুক্তিযোদ্ধারাই, যারা দেশের ভেতরে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত, তারা এসে লিখে দিত। যেমন আমি নিজেও, যুদ্ধে যেমন যোগ দিয়েছি, এসে নিজের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, আমাদের সাহসিকতা বা আমাদের কতজন মারা গেল, শত্রুপক্ষে কতজন মারা গেল, এগুলো আমরাই লিখতাম। তবে এগুলোর বিশেষত্ব হচ্ছে, এগুলোতে কোনো পেশাদার রিপোর্টার নিয়োগ করা ছিল না। মূলত মুক্তিযোদ্ধারা, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মানুষ বিশেষ করে রিফিউজি যারা, দেশের ভেতরের ছিন্নমূল মানুষ তারা এগুলো করত।

Dhaka University Institutional Repository

আপনি কি একটা পত্রিকাতেই লিখেছেন?

আমি মূলত যুদ্ধের সময় কাজ করেছি। আমি তো মূলত একজন গেরিলা যোদ্ধা। কিন্তু আমি যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের এমএসএস পর্বের ছাত্র ছিলাম। সে হিসেবে আগ্রহ ছিল সাংবাদিকতায়। তখন আমাকে যুদ্ধের প্রাথমিক দিনগুলোতে এপ্রিল মাসে মুজিবনগর বা তখন কলকাতায় যেতে হয়। তখন মুজিবনগর সরকারের মুখপত্র 'জয়বাংলা' ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের রণাঙ্গন সংবাদদাতা হিসেবে ১১ নম্বর সেক্টরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। কাজেই আমার যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যপ্তিতে একদিকে যেমন রণাঙ্গনের সাংবাদিকতা করা হয়েছে, অন্যদিকে সশস্ত্রভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

রৌমারী থেকে যে পত্রিকাটা বেরুতো ওটা সম্পর্কে কিছু বলবেন?

রৌমারী থেকে যে পত্রিকাটা বেরুতো ওর নাম অগ্রদূত। এর কিছু কপি আমার কাছে আছে। মূলত এটার সম্পাদক ছিলেন আজিজুল ইসলাম মাস্টার সাহেব। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। তিনি ছিলেন রৌমারীর সবচেয়ে বড় হাইস্কুলের হেডমাস্টার। মুক্তিযুদ্ধে এ লোকটির অসামান্য অবদান। কিছুদিন আগেও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি রৌমারীর মুক্তাঞ্চলের সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। উনার নেতৃত্বে ও সম্পাদনাতেই পত্রিকাটি বেরুত। তখন তো এদিকে কোনো প্রেস ছিল না। উনার স্কুলে বেশ বড় একটা সাইক্লোস্টাইল মেশিন ছিল। সে মেশিনেই সাইক্লোস্টাইল করে কপিগুলো রিফিউজিদের মধ্যে, দেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে দেয়া হতো।

আওয়ামী লীগের মুখপত্র ছিল জয়বাংলা, কম্যুনিস্ট পার্টিরও ছিল একটি। এরকম মোট কয়টি প্রকাশনা ছিল?

আমি প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি। আমি যে রিসার্চটা করেছি তাতে ৬০টিরও বেশি সংবাদপত্রের সন্ধান পেয়েছি। দেখেছিও অসংখ্য। যেমন আগরতলা থেকে শুরু করে, কুমিল্লা-আখাউড়ার ওপারেই যে ত্রিপুরা, ত্রিপুরা থেকে শুরু মেঘালয়, মেঘালয় থেকে শুরু করে আসামের একটা অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গ, পুরো এলাকা দিয়ে অসংখ্য পত্রিকা অনিয়মিতভাবে বেরিয়েছে। এগুলোর তো তালিকা এখন পাওয়াই যায় এবং এগুলো, মুক্তাঞ্চলে, একটা মাত্র মুক্তাঞ্চল তো আর ছিল না... আর রৌমারী মুক্তাঞ্চলটা হল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মুক্তাঞ্চল যেখানে পাকিস্তানি বাহিনী শত চেষ্টার পরও কোনোদিন প্রবেশ করতে পারেনি। যার ফলে

এখান থেকে আমাদের পত্রিকা বের করা শুরু হয়েছে। তো আমি রৌমারীতে দীর্ঘদিন ছিলাম না। আমি রণাঙ্গনের বেশ কিছু এলাকায় গিয়েছি। তো এই যে মুক্তাঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা, বিশেষ একটা পারপাস এরা পূরণ করেছে। সেটা হচ্ছে যে, আমাদের দেশ তখন তো পাকিস্তান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে, গণহত্যা চলছে, নারী নির্যাতন চলছে, ঘরবাড়ি, মানুষজন পালিয়ে যাচ্ছে। তখনও দেশ থেকে জোর করে পাকিস্তানিরা আমাদের পত্রপত্রিকা বের করেছে। যেমন ইত্তেফাক, সংবাদ। ইত্তেফাক তো পুড়িয়েই দেয়া হলো। এরা কখনোই মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কোনো কথা বলতে পারেনি, লিখতে পারেনি। তখন একটা গ্যাপ হয়ে গেল আমাদের। আমাদের দেশিয় পত্রিকাগুলো তো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লিখছে না, লিখতে পারছে না তারা। এই গ্যাপটাকে পূরণ করল এই সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে, মুক্তাঞ্চল থেকে বা ভারতীয় অংশ থেকে বের হওয়া অনিয়মিত মুক্তিযুদ্ধের পত্রিকা। এগুলো তখন দেশের ভেতরে আসত। মানুষ পড়ত। এ পত্রিকাগুলোর আরেকটা বড় উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। যে এখন কী করতে হবে, না করতে হবে।

আরেকটা বিষয় ছিল যে, কমিউনিস্টদের পত্রিকা, আওয়ামী লীগের পত্রিকা। এ ধরনের ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের পত্রিকাগুলোর মধ্যে কি কোনো বিভাজন দেখা গেছে?

আমার কাছে মনে হয় না। তবে কমিউনিস্ট যারা সে সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। কারণ তখন একটা গণজাগরণের একটা ব্যাপার ছিল। তারা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্লেষণ করেছে। তখন অনেক কমিউনিস্ট ছিল যারা মুক্তিযুদ্ধকে মানেইনি দেশের মধ্যে, একটা পুরো পাকিস্তানের লড়াই বলতো আর কি। কিন্তু আমি মনে করি, মেইনস্ট্রিম যারা, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশ এখন যারা আছে, এরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষেই শুধু নয়, এরা অংশগ্রহণও করেছে। তাদের নিজস্ব একটা গেরিলা বাহিনীও তারা তৈরি করেছিল বিভিন্ন জায়গাতে। কিন্তু আসলে আওয়ামী লীগের মুখমাত্র হলেও, মুক্তিযুদ্ধের বা মুজিবনগর সরকারের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল জয়বাংলা পত্রিকা এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। সেটা কিন্তু আওয়ামী লীগের মুখপত্র হয়ে থাকেনি, মূলত মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে কমিউনিস্টদের পক্ষে বেরিয়েছিল সেটা আমি জানি। কিন্তু

যতটুকু আমি দেখেছি, তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেই লিখেছে, যার মধ্যে তাদের দলীয় একটা দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে লক্ষ্য করা গিয়েছে।

মুক্তাঞ্চল ও প্রবাসী সরকার এ দুই অঞ্চল থেকে যে পত্রিকাগুলো বেরিয়েছে, সেগুলো মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে বিশ্বজনমত গঠনে কী ভূমিকা রেখেছে বলে আপনার মত?

এক্ষেত্রে আমার জানামতে দি পিপল নামে বাংলাদেশের একটা ইংরেজি পত্রিকা ইন্ডিয়া থেকে বেরুত। আর বাকি সবই কিন্তু বের হতো বাংলায়। একটা বড় জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, এ কাগজগুলো শুধু যে আমাদের দেশের মধ্যেই দেয়া হয়, কিংবা রিফিউজি বা মুক্তিযোদ্ধারা পড়ত, অবরুদ্ধ বাংলাদেশের মানুষ পড়ত, তা নয়। এগুলো কিন্তু বিদেশিদের আকৃষ্ট করেছে। আমার একটা অভিজ্ঞতা বলি, আমি যখন রৌমারীতে ছিলাম, এনবিসি টেলিভিশন টিম আসলো। মুক্তিযুদ্ধের উপর রিপোর্ট করার জন্য। তখন কাদের সিদ্দিকীও ওখানে ছিলেন কিছুদিনের জন্য। তারও পোর্টফোলিও করল তারা। তারা যদিও বাংলা পড়া জানত না, তাদের লোক ছিল। আমাদের অনেক কাগজ তারা নিয়ে গেল। এরকম রণাঙ্গন থেকে যে কাগজগুলো বের হতো তার বেশিরভাগই, সব হয়তো পারেনি, তারা সংগ্রহ করে নিয়ে গেল। আর এ থেকে তারা, আমাদের একটা ভাইব্রেন্ট ফাইটিং নেশন হিসেবে ধরে মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি কী অবস্থায় আছে তার প্রতিবেদন করত। আমি মনে করি, এধরনের কাগজগুলো নিশ্চয়ই বহির্বিশ্বেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে একটা জনমত সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা পালন করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধাদের ঘটনাগুলো, ঠিক কীভাবে উঠে আসত পত্রিকায়? ধরা যাক কেউ মারা গেল কিংবা মুক্তিযুদ্ধে কারা যোগ দিল এগুলো কীভাবে সংবাদের তথ্য হিসেবে উঠে আসত।

আসলে এই প্রতিটা কাগজেই এখন তোমরা যদি এনালাইজ করে দেখ, দেখবে, প্রত্যেকটা কাগজের বিষয়বস্তুগুলো কী ছিল। পাকিস্তানিরা কোথায় কোথায় অত্যাচার করল, কত বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল, কত মেয়েকে তারা অত্যাচার করল, এবং মুক্তিযোদ্ধারা কি করে তাদের প্রতিরোধ করল, বাংলাদেশে কীভাবে ইসলামের নাম নিয়ে অত্যাচার করা হচ্ছে, এগুলোই মূলত ছিল খবরের মূল বিষয়বস্তু। কাজেই এখানে

ব্যক্তিগত দৈনন্দিন খবরাখবর, মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত সবই আসত। আর তাই গণহত্যা ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশের খবর অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই উপজীব্য ছিল সংবাদপত্রগুলোর নিয়মিত প্রকাশনায়।

আপনি তো মুক্তিযুদ্ধের একদম শুরুর দিকেই ছিলেন। তো একটা দল কিংবা একটা ভূখণ্ডের মানুষ যে মুক্তিযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন কি সত্যিকার অর্থে পত্রিকাগুলো যোদ্ধাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছিল?

না, এটা হচ্ছে যে, মুক্তিযুদ্ধটা আমাদের হয়েছে মূলত গেরিলা যুদ্ধ। তারপর ফ্রন্টাল ফাইট শুরু হয়েছে অনেক পরে। যেটাতে আমাদের সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, সেটা হয়েছে অনেক পরে। অনেক ফ্রন্টাল ফাইটও হয়েছে। কিন্তু প্রথমদিকে যুদ্ধের আক্রমণের চরিত্রটাই ছিল গোপন। কাজেই কোথায় আক্রমণ করতে যাবে ঘোষণা করে তো যায়নি।

কিন্তু এমনটা হতে পারে না যে, পত্রিকার মাধ্যমে একটা রোডম্যাপ বা আশাবাদ পেল?

এরকম হতে পারে, হয়তোবা হয়েছে। হয়তো একটা পত্রিকা লিখল যে অমুক জায়গায় একটা অত্যাচার হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধারা পরবর্তী সময়ে সেখানে আক্রমণ করেছে। সেটা হয়েছে। তবে মূলত, এটা গোপন ব্যাপার হওয়ায় আক্রমণটা গোপন রাখা হতো, আক্রমণের আগ পর্যন্ত।

গণহত্যার বিষয়টা পত্রিকাগুলোতে কীভাবে আসত?

গণহত্যার বিষয়টা খুব প্রকাশ্যে বেশি করে এসেছে এবং দেশে পাকিস্তানি এবং তাদের এদেশিয় দোসররা আলবদর রাজাকাররা যে অত্যাচার-নির্যাতন করেছে এগুলো খুব সচিত্রভাবে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তখনকার ক্যামেরার, তুমি জানো আমি অনেক ছবি তুলেছি মুক্তিযুদ্ধের সময়। ঘটনাচক্রে আমার কাছে হয়ত একটা ক্যামেরা এসে গিয়েছিল। কিন্তু সবার কাছে তো ছিল না। কিন্তু আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধা অপারেশনের সময় ক্যামেরা নিয়ে যেত। অনেক ছবিও তারা এনেছে।

আপনি সাংবাদিকতার ছাত্র হিসেবে এবং একজন নিয়োগপ্রাপ্ত সংবাদকর্মী হিসেবে আপনাকে তৎকালীন একজন পেশাদার সাংবাদিক বলা যায়। যারা পত্রিকাগুলোতে খবর দিতেন, তারা কি আপনার মতো পেশাদার সাংবাদিক ছিলেন? সেই পেশাদার সাংবাদিকরা সংখ্যায় কেমন ছিলেন?

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যারা ওসব পত্রপত্রিকায় কাজ করেছে, তাদের মধ্যে পেশাদার সাংবাদিকের সংখ্যাটা ছিল খুবই কম। সাদেজ চৌধুরী, তখন দৈনিক পাকিস্তানের সাবএডিটর ছিলেন। এখান থেকে যুদ্ধে গিয়ে সিলেটের ধল্লা এলাকায় সাবসেক্টর কমান্ডার ছিলেন। তবে এরকম পেশাদার সাংবাদিকের সংখ্যাটা খুব কম ছিল। পরবর্তী সময়ে অনেকে সাংবাদিক হয়েছে, বা সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, রিফিউজি ক্যাম্পের লেখালেখিতে। তবে রণাঙ্গন থেকে তাদের ওভাবে সংবাদ সংগ্রহের বিষয়টা তেমন দেখা যায় না।

পত্রিকাগুলোর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বিষয়টায় ফিরে আসি।

হ্যাঁ তা ছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে যেহেতু রাজনীতিকরণ হয়েছে, কিংবা রাজনীতিরই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ হলো মুক্তিযুদ্ধ। তখনকার রাজনীতিটা কী ছিল। পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন হল, আওয়ামী লীগ ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। সব সিটই পেল। তখন ভাসানী ন্যাপ নির্বাচন বয়কট করল। কমিউনিস্ট পার্টি তো তখন হয়ই নি। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি তো আওয়ামী লীগের সঙ্গেই ছিল। আওয়ামী লীগই তখন মুখ্য রাজনৈতিক শক্তি। কাজেই বিভাজন কিন্তু ওভাবে দেখা যায়নি। বিভাজন তো এখন দেখছি। তখন দেখিনি। তবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, তারপরও বলতে হবে, সব দল-মতের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছে। অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তখন রাজনৈতিক বিভাজন তো এমন আজকের মতো প্রকট ছিল না। তখন পাকিস্তানবিরোধী একটা মনোভাব ছিল। আর আওয়ামী লীগ মুখ্য দল হিসেবে তার নেতৃত্ব দিয়েছে। সেই ফোল্ডের মধ্যে সবাই চলে এসেছে। এই আর কি।

পত্রিকাগুলো কেন হলো?

আমার দুটো কথা বলব? আমি কয়েকটা জিনিস দেখি। এক হচ্ছে, আমাদের দেশের কাগজ, অবরুদ্ধ বাংলাদেশের যে পত্রপত্রিকাগুলো, যেগুলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা শাসকগোষ্ঠী বাধ্য করেছিল পাকিস্তানের

পক্ষে কথা বলতে। মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলতে। এটা একটা কারণ যে আমরা বা মুক্তিযুদ্ধের মানুষ, অনুভব করছিলাম যে আমাদের কিছু কাগজ থাকা উচিত। যে কাগজগুলো আমাদের কথা বলবে। দুই নম্বর হচ্ছে, আমরা মনে করেছিলাম বাঙালি জাতি তো খুব ভাগ্যের একটা জাতি। আমাদের অসংখ্য বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সাংবাদিক, লেখক, শিক্ষক, ডাক্তার সীমান্তের ওপারে চলে গেছে। তাদের একটা অবদান রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধের পেছনে। তখন তারা অনেক মানুষকে মোটিভেট করতে পত্রিকার মাধ্যমে, রিফিউজিদের মনোবল ধরে রাখতে একটা উদ্যোগ নেয়ার কথা ভাবল। তারা তখন ভাবল এ ধরনের একটা পত্রিকা হলে ভাল হয়। তখন সবাই মিলে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পত্রিকাটা বের করেছে। তিন নম্বর কারণ হচ্ছে, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক নিঃসন্দেহে, সেটা হচ্ছে, আমরা তখনও জানতাম না যে এই যুদ্ধ ঠিক কতদিন স্থায়ী হবে। কাজেই আমাদের জনগোষ্ঠী, একটা পত্রিকার যে কাজ থাকে, এখনকার দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিকগুলো যে কাজ করে, প্রচার করা-ইনফর্ম করা-এডুকেট করা, তার জন্য আমরা একটা বৃহত্তর ও দীর্ঘস্থায়ী মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক দিকে আমরা চিন্তা করেছিলাম যে পত্রিকাগুলো আমাদের সাধারণ মুক্তিযুদ্ধকামী মানুষের মুখপত্র হয়ে উঠবে।

আপনি তো জয়বাংলা'র সঙ্গে ছিলেন, রৌমারীর অগ্রদূতের কোনো পদে ছিলেন?

আমি, ঠিক ওভাবে ছিলাম না, আমার নাম পত্রিকায় ছাপা হতো না। কিন্তু আমি অসংখ্য লেখালেখি করেছি, আমার নামও ওসব লেখায় আছে। কিন্তু আমি তো মুভিং ছিলাম। আমি ওদের একজন সংগঠক রিপোর্টার বলা যায়। ওখানে তো সাদাকার হোসেন এমপি ছিল, তারপর পাপ্পু মিয়া ছিল, এরকম অনেকে ছিল।